
চিত্রে জয়দেব
ও
গীতগোবিন্দ

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
"দেব সাহিত্য-কুটীর"
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

সম্পাদনা করেছেন—
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশিত হয়েছে—
আষাঢ়
১৩৫৩

ছবি এঁকেছেন—
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শ্রীবলাইবন্ধু রায়

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন—
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেপেছেন—
এস, সি, মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

অনুবাদকের নিবেদন

ভারতের অমর গীতি-কাব্য, কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ বাংলা ভাষায় অনূদিত করে বাঙালী পাঠক-পাঠিকার সামনে উপস্থিত করা হলো।

কবিতার অনুবাদ কবিতায় কখনই সুষ্ঠু হয় না, বিশেষ করে শ্রেষ্ঠ কবিতাকে এক ভাষার অন্তঃপুর থেকে অন্য ভাষার অন্তঃপুরে যদি যেতে হয়, তাহলে তার আদিম মাধুর্য্য অনেকখানি হারিয়ে যায়। তাই জয়দেবের বক্তব্য ও ভাব-রসকে বাংলা ভাষায় যতখানি সম্ভব ফুটিয়ে তোলা যায়, তারই আশায় গদ্য-কবিতার পদ্ধতিকে আশ্রয় করেছি এবং সেই জন্যেই কোন কোন জায়গায় ভাষার অনুবাদ না ক'রে ভাবের অনুবাদ করেছি।

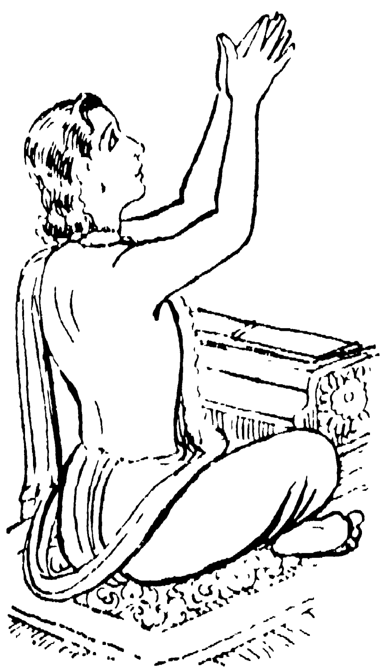
কবি জয়দেবের জীবনীতে আমি ইচ্ছা করেই কোন কোন জায়গায় জগন্নাথকে বিশ্বনাথ বলে উল্লেখ করেছি। আমার অনুরোধ, পাঠকবর্গ যেন বিশ্বনাথ শব্দটিকে বিশেষণরূপেই গ্রহণ করেন, কারণ যিনি জগৎ-নাথ, তিনিই বিশ্ব-নাথ।

এই অনুবাদ-কার্য্যের সময় আমি দীর্ঘকাল কঠিন ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে বাধ্য হই। তার জন্যে হয়ত দায়িত্ব-পালনে কোথাও কোথাও ত্রুটি হয়ে গিয়ে থাকবে। তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

ইতি

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

হে দেব, তোমার চরণ নিয়েছি শরণ,
শরণাগতের কুশল জানি তুমি
করবে বিধান ॥



তোমারি প্রসাদে কবি জয়দেবের এই গান
উজ্জ্বল রস প্রধান
যেন করে জগতের আনন্দ বিধান ॥

৩।। বিষয় সূচী ।।৩

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

কবি জয়দেব

জীবনী

বিষয় | পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় খণ্ড

গীতগোবিন্দ

সানুবাদ

তৃতীয় খণ্ড

পরিশিষ্ট

গীতগোবিন্দ আলোচনা

চিত্রসূচী

দ্বিবর্ণ

ত্রিবর্ণ





কবি জয়দেব

আজ থেকে প্রায় আটশো বছর আগেকার বাংলা।

বাংলায় রাজা তখন বল্লাল সেন। বৃদ্ধ হয়েছেন। যুবরাজ লক্ষ্মণ সেনই তখন বৃদ্ধ পিতার হয়ে রাজ-কার্য্য পরিচালনা করেন।

যুবরাজ লক্ষ্মণ সেনের পরাক্রমে গৌড়-রাজ্য কলিঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। তাঁর বীরত্বের কাহিনী নিয়ে কবিরা কাব্য লিখেছেন। যখন তিনি শিশু, তখন থেকেই তীরধনুক নিয়ে রীতিমত অস্ত্রবিদ্যা শিখতে আরম্ভ করেন। কথিত আছে সেই বালককালেই তাঁর নিক্ষিপ্ত বাণ গঙ্গার এ-তীর থেকে ও-তীরে গিয়ে পড়তো।

কিন্তু আজ আর রাজত্বে যুদ্ধের কোন আবহাওয়াই নেই। পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে গৌড়রাজ্যের প্রজারা যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা ভুলে গিয়েছে। নিয়মিত যোদ্ধারাও ক্রমশঃ অস্ত্র ত্যাগ করে নাগরিক জীবনের শান্ত স্রোতে গা ঢেলে দিয়েছে।

এ হেন সময়ে যুবরাজ লক্ষ্মণ সেনের কাণে একদিন ভয়াবহ এক গুরু-নিন্দার কথা ভেসে এলো। পিতৃ-নিন্দা। বৃদ্ধ বল্লাল সেন নাকি এক তরুণী চণ্ডালরমণীর সঙ্গে সংগোপনে প্রেম-লীলা করছেন!

যুবরাজ লক্ষ্মণ সেন রীতিমত ব্যথিত হলেন। বৃদ্ধ পিতা সম্বন্ধে এ হেন কুৎসায়, যে-কোন তরুণ পুত্রেরই মনে ক্ষোভ জন্মায়, বিশেষতঃ সে-পিতা আবার দেশের রাজা। তাঁরই আদর্শে একদিন এই গৌড়-সমাজে মানুষের কৃতিত্বের উপর মানুষের কৌলীন্যের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, সেই তিনিই কি না এই বৃদ্ধ বয়সে এক তরুণী চণ্ডালরমণীর কামে নিজের সমস্ত চারিত্রিক মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দেবেন?

যুবরাজ লক্ষ্মণ সেন অনুসন্ধান করতে লাগলেন, এ কুৎসার মূল কোথায়? কিছুদিন যাবৎ বল্লাল সেন রাজপ্রাসাদ থেকে অনুপস্থিত। রাজপুরচারীদের ধারণা তিনি কোথাও গঙ্গার ধারে নির্জ্জন-বাস করতে গিয়েছেন।



লক্ষ্মণ সেন অনুসন্ধান করে জানলেন, বৃদ্ধ পিতা সেই চণ্ডাল-রমণীকে নিয়ে নির্জ্জন এক উদ্যানে তান্ত্রিক শক্তি-সাধনা করছেন। অন্ততঃ এইভাবেই সংবাদটা তাঁর কাছে অনুসন্ধানের ফলে এলো।

তন্ত্র-সাধনার নামে তখন সমগ্র রাঢ় আর বরেন্দ্রভূমিতে এক জাতীয় সংগোপন কামলীলা সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে আরম্ভ করেছে। পরিপূর্ণ শান্তি আর স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মানুষের অলস মন তখন একমাত্র যৌন-তৃপ্তির মধ্যে জীবনের বিচিত্রতার স্বাদ উপভোগ করতে চলেছে। ধর্ম্মও বিকৃত হয়ে সমাজের এই কাম-লিপ্সার সহায়ক হয়ে উঠেছে। তান্ত্রিক সাধনার নামে নারী-উপাসনাকে কেন্দ্র করে সংক্রামক ব্যাধির মতন এই

চরিত্রহীনতা আর যৌন-লিপ্সা সমাজকে পেয়ে বসেছে। এবং তার পরিণাম যে কি হয়েছিল, তা লক্ষ্মণ সেন বৃদ্ধ বয়সে নিজে চোখে দেখে গিয়েছিলেন। মুষ্টিমেয় তুর্কী সৈন্য এসে অনায়াসে এই বীর্য্যহীন ভ্রষ্টচরিত্র জাতিকে পদানত করে। সেই সামাজিক অধঃপতন বল্লাল সেনের আমল থেকেই সুরু হয়।



বৃদ্ধ পিতার সেই সংগোপন আচরণে তরুণ যুবরাজের অন্তর ক্ষুণ্ণ ও বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। তরুণ লক্ষ্মণ সেনের মনে একটা আভিজাত্য-সুলভ মহত্তর জীবনের প্রতি আস্পৃহা ছিল, তাতে নিদারুণ আঘাত লাগলো। লক্ষ্মণ সেন নীরবে পিতার এই পরিবর্ত্তনকে সহ্য করতে পারলেন না। তিনি সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে পিতাকে পত্র লিখলেন এবং সেই পত্রে তাঁকে নিবৃত্ত হতে অনুরোধ করলেন।

বৃদ্ধ বল্লাল সেন পুত্রের এই আচরণকে ঔদ্ধত্য হিসাবে দেখলেন এবং তান্ত্রিক সাধনার দোহাই দিয়ে নিজের কৃত-কর্ম্মকে সমর্থন করলেন।

এই নিয়ে পিতা-পুত্রে রীতিমত একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হলো। যুবরাজ লক্ষ্মণ সেন অভিমানে কিছুদিনের জন্য রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে বসবাস করতে লাগলেন।

অজয় নদের ধারে এই কেন্দুবিল্ব গ্রাম। অজয়ের ধারে এই গ্রামে

সেনবংশেরই নির্ম্মিত এক দুর্গ ছিল, সেনপাহাড়ী নামে তা জনসাধারণে পরিচিত ছিল। পিতার উপর অভিমান করে যুবরাজ লক্ষ্মণ সেন কেন্দুবিল্বের এই সেনপাহাড়ী দুর্গে এসে বাস করতে লাগলেন।



ঠিক সেই সময় এই অজয় নদের তীরে কেন্দুবিল্ব গ্রামে একজন তরুণ ব্রাহ্মণ-যুবা আপনার মনে শাস্ত্র আর কাব্য-চর্চ্চা করে চলেছিলেন। সেই যুবক-কবির কাব্য-প্রতিভাই এক দিন লক্ষ্মণ সেনের নামকে বাংলার কৃষ্টির ইতিহাসে অমর করে রেখে দিয়ে যায়। সেই যুবক-কবিই হলেন জয়দেব গোস্বামী, শ্রীশ্রী গী ত গো বি ন্দ কাব্যের অমর রচয়িতা।

দুই

গী ত-গো বি ন্দে র শে ষ শ্লোকে কবি জয়দেব নিজেই তাঁর মাতাপিতার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন।

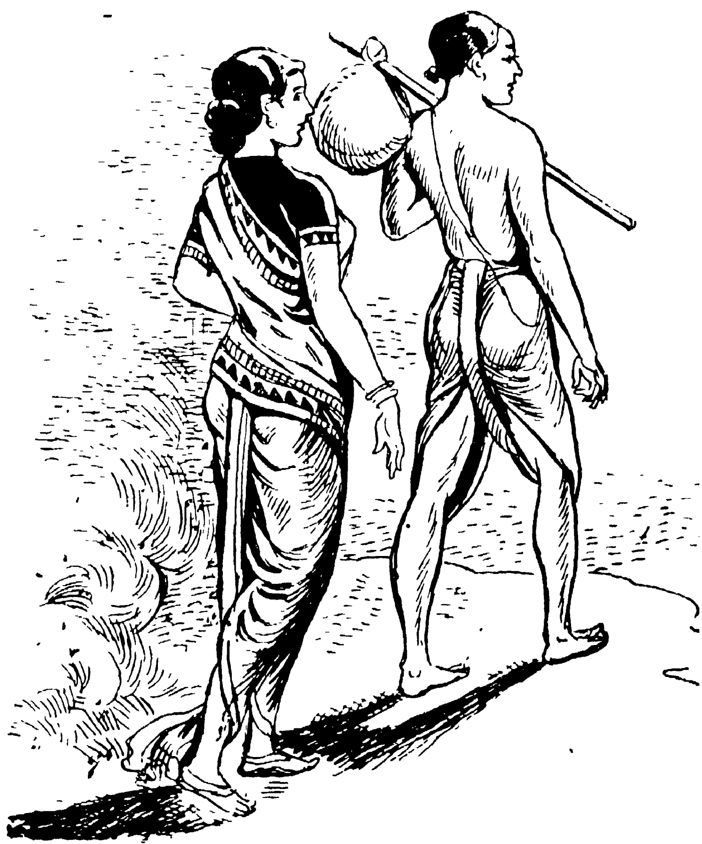
পিতা শ্রীভোজদেব, জননী বামা দেবী। এ ছাড়া কবির সাংসারিক জীবনের আর কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না তাঁর লেখা থেকে।

তাঁর লেখা থেকে আর দুটি নাম পাওয়া যায়। একটি নাম হলো, তাঁর কোন প্রিয় বন্ধুর, পরাশর। গীতগোবিন্দ কাব্য লিখে কবি ফুলের মালার মতন সেই কাব্যকে প্রিয় বন্ধুর গলায় উপহারস্বরূপ দিয়ে গিয়েছেন। আর একটি নাম হলো, তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর, পদ্মাবতী। পদ্মাবতীর চারণ

কবিরূপে যেভাবে কবি নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন, প্রিয়তমা পত্নীর সেই নামোল্লেখের ভেতর থেকে বোঝা যায়, কি নিবিড় প্রেম ছিল তাঁদের দুজনার মধ্যে। জীবনের মর্ম্মমূলে থেকে যে নিবিড় প্রেম তাঁকে জাগিয়ে তোলে, সেই প্রেমেরই দিব্য প্রকাশ দেখি তাঁর সৃজিত কাব্যে।

একান্ত দুঃখের বিষয়, বাংলার এই মহাকবির জীবনের কাহিনী কালের অতল তলে হারিয়ে গিয়েছে, পড়ে আছে শুধু কতকগুলি কাহিনী আর কিম্বদন্তী। তাই থেকে এখানে চেষ্টা করেছি, কল্পনায় আর সত্যে মিশিয়ে বাংলার সেই অমর কবির জীবনকে গেঁথে তুলতে।

তিন



নীল সমুদ্রের ধারে পুরীধামে জগন্নাথদেবের মন্দির।

স্নানযাত্রা উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসেছে যাত্রীর দল, শত শত মাইল পায়ে হেঁটে তারা এসেছে জগন্নাথদর্শনে। জগন্নাথদেবের চরণে নিবেদন করতে অন্তরের বাসনা। নীলাচলবাসী জাগ্রত ভগবান, অন্তরের ভক্তির আকুলতায় আর একাগ্রতায় পুরুষোত্তমের কাছে যে যা প্রার্থনা করে, তাই নাকি সিদ্ধ হয়। নীলসমুদ্রের তীরে জেগে আছেন চিরজাগ্রত জগন্নাথ।

যাত্রীদের ভিড়ের ভেতর থেকে দেখা যায় দক্ষিণ-দেশবাসী এক দম্পতীকে।

স্বামী-স্ত্রীতে সমুদ্র-স্নান করে উঠে ইষ্টনাম জপ করে, তারপর সেই সিক্ত বসনেই জগন্নাথদেবদর্শনে মন্দিরে যাত্রা করে।

সারাদিন মন্দিরে উপবাসী থেকে জগন্নাথদেবের পূজা করে। মন্দির-সংলগ্ন চত্বরে সেই অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীতে ধর্না দিয়ে শুয়ে থাকে। যতক্ষণ না জগন্নাথ-দেব দর্শন দিচ্ছেন, ততক্ষণ সেই দম্পতী সেই অবস্থায় ধর্না দিয়ে শুয়ে থাকে।

তৃতীয় দিনের রাত্রিতে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গেই স্বপ্ন দেখলো, মন্দিরচত্বর আলোকিত করে এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি আবির্ভূত হলো, তুজনের দিকে আলোক-হস্ত প্রসারিত করে আশীর্ব্বাদ করলেন, তোমাদের বাসনা পূর্ণ হবে!

দম্পতী আনন্দিতচিত্তে প্রভাতে ভূমিশয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়ে। জগন্নাথ-দেবের নাম কীর্ত্তন করতে করতে পুনরায় সমুদ্র-স্নান করে। স্নান-অন্তে মন্দির-পরিভ্রমণ করে আনন্দিতচিত্তে আবার স্বদেশে ফিরে যায়। স্বপ্নে জগন্নাথ-দেব স্বয়ং আশ্বাস দিয়েছেন, তাদের বাসনা সার্থক হবে। দম্পতীর অন্তর থেকে সব খেদ দূর হয়ে যায়।

দম্পতীর অন্তরের একমাত্র বাসনা ছিল, সন্তানলাভ। তাদের আনন্দের সংসারে ছিল না কোন শিশু। সন্তানের অভাবে অন্তরের সমস্ত স্নেহ-ক্ষুধা অন্তরেই নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছিল। তাই স্বামী-স্ত্রীতে বহু দেবতার দরজায় ধর্না দিয়েছে, বহু দেবতার কাছে মানৎ করেছে কিন্তু কোন দেবতাই তাদের অন্তরের আহ্বানে সাড়া দেয় নি। তাই শপথ করে জগন্নাথদেবের শরণাপন্ন হয়, শপথ করে যে জগন্নাথদেব যদি পুত্র-সন্তান দেন, তাহলে সে-সন্তানকে তাঁরই সেবায় নিযুক্ত করবে, যদি কন্যা দেন তাহলে সে কন্যাকে তাঁর দাসীরূপেই তাঁর কাছে উৎসর্গ করবে। জগন্নাথদেব তাদের সেই আকুল আহ্বানে সাড়া দিলেন। আশ্বাস দিলেন, অচিরেই তাদের মনোবাঞ্ছা সফল হবে।

চার

অচিরেই তাদের মনোবাঞ্ছা সফল হলো। জগন্নাথদেবের আশীর্ব্বাদে ব্রাহ্মণের স্ত্রী গর্ভবতী হলো এবং যথাকালে ব্রাহ্মণের ঘর আলো করে জন্মগ্রহণ করলো, পুত্র নয়, এক অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী কন্যা। কন্যার রূপ দেখে ব্রাহ্মণ-দম্পতীর মন আনন্দে ভরে উঠলো। ব্রাহ্মণ কন্যার নাম রাখলো পদ্মাবতী।

শৈশব থেকেই পদ্মাবতী বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিতে লাগলো। কেউ তাকে শিখায় নি, অথচ শিশু সঙ্গীত শুনলেই আপনা থেকে নাচতে

আরম্ভ করে। এবং তার নৃত্য-ভঙ্গিমা দেখে গুণীরা পর্য্যন্ত অবাক হয়ে যান। যে-গান, যে-সুর বালিকা একবার মাত্র শোনে, অবিকল সেই সুর তৎক্ষণাৎ বালিকার কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়। এতটুকু ভুল হয় না, এতটুকু সুরের হেরফের হয় না। কোথা থেকে বালিকা পেলো এই সুর-জ্ঞান? কোন্ জন্মান্তরের সুশিক্ষা আজও চলেছে বালিকাকে অনুসরণ করে?

পদ্মাবতীর পিতা উপযুক্ত শিক্ষক রেখে কন্যাকে সঙ্গীত ও নৃত্যবিদ্যা শিক্ষা দেন। শৈশব থেকে পদ্মাবতী ক্রমে কৈশোরে পদার্পণ করে। কিশোরী পদ্মাবতীর তনু দেহে কোথা থেকে আবির্ভূত হয় বিস্ময়কর এক দেহ-বিপর্যয়। কাল যে ছিল শিশু, আজ তার দেহ লাবণ্য আর রূপ-রেখায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিপুণ চিত্রকরের আঁকা ছবির মতন পদ্মাবতীর রূপ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আপনাতে আপনি বিভোর হয়ে পদ্মাবতী যখন নাচতো, তখন মনে হতো স্বর্গ থেকে যেন দেবকন্যা আকাশ-চ্যুত হয়ে মর্ত্ত্যে এসেছে। সেই অপরূপ কন্যার দিকে চেয়ে চেয়ে ব্রাহ্মণ-দম্পতীর অন্তর আনন্দে ভ'রে উঠতো। যেদিন ব্রাহ্মণ নিঃসন্তান ছিল, সেদিন সন্তান-কামনায় জগন্নাথদেবের কাছে যে-শপথ করেছিল, আজ আর সে-শপথের কথা ব্রাহ্মণের মনেই পড়ে না। সেই অনন্যা কন্যাকে ছেড়ে থাকবার কথা ব্রাহ্মণ-দম্পতী কল্পনাও করতে পারে না।



একদিন হঠাৎ ব্রাহ্মণের দ্বারে এক সাধু এসে উপস্থিত হলেন। সাধু ভিক্ষা চাইলেন। পিতার ইঙ্গিতে পদ্মাবতী ভিক্ষাপাত্রে ভিক্ষা নিয়ে এলো। পদ্মাবতীকে দেখে সাধু হেসে উঠলেন। সে-হাসির অর্থ বুঝতে না পেরে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলো, হাসলেন যে?

পদ্মাবতী ভিক্ষা দিয়ে বাড়ীর ভিতর চলে গেলে সাধু জিজ্ঞাসা করলেন, এ মেয়েটি কে?

ব্রাহ্মণ সগর্ব্বে বলে, আমারই মেয়ে!

সাধু এবার অট্টহাস্য করে উঠলেন, বল্লেন, তোমার মেয়ে?

ব্রাহ্মণ বিরক্ত হয়ে বল্লো, হাঁ, আমারই মেয়ে, তাতে আপনার প্রশ্ন করবার কি আছে?

এবার সাধু গম্ভীর কণ্ঠে বল্লেন, মেয়ের অঙ্গে যে চিহ্ন দেখলাম, তাতে আমার স্থির বিশ্বাস, এ কন্যা দেবতার! দেবতার নৈবেদ্য! দেবতার নৈবেদ্যে মানুষের তো অধিকার নেই!

সহসা বিদ্যুৎ-ঝিলিকে অতীতের এক বিস্মৃত-প্রায় দিনের স্মৃতি জেগে ওঠে ব্রাহ্মণের বুকে। জগন্নাথদেবের মন্দির-চত্বরে সন্তান-আশায় পড়ে আছে স্বামী-স্ত্রী দুজনে দেবতার চরণ ধরে। মনে পড়ে ভুলে-যাওয়া সেই শপথের কথা, যদি কন্যা হয়, তাহলে তোমার দাসী করে তাকে পাঠিয়ে দেবো তোমার মন্দিরে!

সাধুর কথায় নিমেষে ব্রাহ্মণের অন্তরে ঘটে যায় বিপুল এক বিপর্য্যয়। পাংশু হয়ে আসে ব্রাহ্মণের মুখ। কম্পিতকণ্ঠে ব্রাহ্মণ বলে, হে সন্ন্যাসী, তোমার দৃষ্টি ভুল দেখে নি। এই কন্যা জন্মাবার আগে, আমি শপথ করেছিলাম, কন্যাকে দেবদাসীরূপে জগন্নাথমন্দিরে সমর্পণ করবো!

স্মিতহাস্যে সাধু বলেন, সে-শপথ রক্ষা কর আজ! দেবতার যা প্রাপ্য, মানুষের লোভে ঘটিয়ো না তার অন্তরায়!

বেদনায় আর্ত্তনাদ করে ওঠে ব্রাহ্মণ। বলে, সন্ন্যাসী, তুমি কি বুঝবে অন্ধ পিতৃ-স্নেহের কি জ্বালা? বেশ ছিলাম, ভুলেছিলাম শপথ, কেন তুমি মনে করিয়ে দিতে এলে সাধু?

তেমনি হেসে সাধু বলেন, আমি না এলেও, শপথের কথা তোমাকে মনে

করতেই হতো। দেবতা নিজেই তোমাকে আর কোন উপায়ে স্মরণ করিয়ে দিতেন। ভগবানের নামে উৎসর্গীকৃত যাদের জীবন, তাদের জীবন দিয়ে ভগবান তাঁর নিজের কাজ করিয়ে নেন্। তুমি ভাগ্যবান্, এমন কন্যার জনক হয়েছ। আমি স্পষ্ট



দেখছি, তোমার এই কন্যা কোন মহৎ দৈবকার্য্য সম্পন্ন করবার জন্যেই জন্মগ্রহণ করেছে। তাকে তোমার স্নেহের পাঁচিল দিয়ে বেঁধে রাখতে পারবে না ব্রাহ্মণ!

ব্রাহ্মণ পাথরের মতন নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। সাধু যেমন এসেছিলেন, আবার তেমনি চলে যান।

পাঁচ

ব্রাহ্মণ যতই শপথের কথা ভাবে, ততই বিকল হয়ে ওঠে। দেখতে দেখতে তার আনন্দের স্বর্গলোক কি এক অজানা বিষাদে ম্লান বিবর্ণ হয়ে এলো। অষ্টপ্রহর সেই এক দুশ্চিন্তা ব্রাহ্মণকে ক্ষিপ্তপ্রায় করে তুল্লো।

পিতার সেই ভাবান্তর দেখে পদ্মাবতী পিতাকে আরো নিবিড় স্নেহে বাঁধতে

চেষ্টা করে। পিতা যত মুখভার করে থাকে, পদ্মাবতী ততই হাস্যে, নৃত্যে, সঙ্গীতে, আদরে, আলাপে পিতাকে সারাক্ষণ বেষ্টন করে থাকে। পদ্মাবতী স্নেহে যতই উদ্বেল হয়ে ওঠে, ব্রাহ্মণের অন্তরের বেদনা ততই নিবিড়তর হয়ে উঠতে থাকে। এ কন্যাকে কি করে দেবদাসীর জীবনে নির্ব্বাসিত করা যায়? ব্রাহ্মণ কাতরস্বরে প্রার্থনা করে, হায় জগন্নাথদেব, তুমি কি এতই নির্ম্মম?

ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ নিজের অন্তরে বলসঞ্চয় করে। স্থির করে, শপথের কথা আর সে ভাববে না। আবার পূর্ব্বেকার মতন সহজ স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে। পদ্মাবতীও পিতাকে আনন্দিত দেখে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, তার স্নেহে পিতার অন্তরের বিষাদ সে দূর করতে পেরেছে। আবার নৃত্যে সঙ্গীতে মুখর হয়ে ওঠে ব্রাহ্মণের গৃহাঙ্গন।

কিন্তু দেবতা যাকে চায়, মানুষের সাধ্য কি তাকে ধরে রাখে? দেবতার কাজে যার প্রয়োজন, কোন মাতাপিতার স্নেহ তাকে পারে না আটক করে রাখতে।

সহসা একদিন পদ্মাবতী শয্যাশায়ী হলো। নাচতে নাচতে তার সর্ব্বাঙ্গ ভারী আর অবশ হয়ে উঠলো। অচৈতন্যের মতন সে পড়ে গেল। ব্রাহ্মণ-দম্পতী তৎক্ষণাৎ বৈদ্যকে ডেকে পাঠালো।

বৈদ্য এসে পরীক্ষা করে দেখেন, নাড়ী একান্ত চঞ্চল, অস্বাভাবিক দেহের উত্তাপ। পদ্মাবতীর মুখে কোন কথা নেই। জ্বরে বেহুঁস।

বৈদ্য ওষুধের পর ওষুধ দেন। প্রলেপের পর প্রলেপ। কোন কিছুতেই কোন ফল হয় না। শিয়রে জেগে বসে থাকে মাতা আর পিতা।

হঠাৎ পদ্মাবতী সেই অর্দ্ধ-অচৈতন্য অবস্থার ভেতর থেকে চীৎকার করে ওঠে, যাই, যাই প্রভু!

ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণীর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু-ধারা গড়িয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণের ধারণা, কন্যার অন্তিম মুহূর্ত্ত সমুপস্থিত। সস্নেহে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাবি মা?

পদ্মাবতী বলে, প্রভুর কাছে! জগন্নাথ প্রভুর কাছে! তিনি আমাকে ডাকছেন!

ব্রাহ্মণ বুঝতে পারে। এতদিন আত্ম-প্রবঞ্চনা করে যে-সত্যকে ঢেকে রেখেছিল, নির্ম্মম আঘাতে আজ দেবতা সে-আত্মপ্রতারণার আবরণকে ছিন্ন

করে দিতে উদ্যত হয়েছেন। অমোঘ দেবতার বিধান। ব্রাহ্মণ মনে মনে বলে, হে প্রভু, হে জগন্নাথ, তোমারি ইচ্ছা সফল হোক্! আমি আর আমার স্নেহে তোমার নৈবেদ্য থেকে তোমাকে করবো না বঞ্চিত!

বিস্ময়ের ব্যাপার, রাত-প্রভাত না হতেই পদ্মাবতী শয্যা থেকে উঠে বসে, যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলো। বিগত দিনের জ্বরের কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই দেহমনে।



বৃদ্ধ বৈদ্য রোগী দেখতে এসে পরমোল্লাসে ঘোষণা করেন, তাঁর ওষুধ অব্যর্থ, স্বয়ং ধন্বন্তরির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তিনি করতে পারেন!

ব্রাহ্মণ নীরবে শুধু উপলব্ধি করে, কোন্ মহাবৈদ্যের চিকিৎসায় ঘটলো এই অঘটন।

ব্রাহ্মণ সাশ্রু-নেত্রে সমস্ত কথা পদ্মাবতীকে জানায়, তার জন্মাবার আগে কিভাবে শপথ করে তাকে জগন্নাথদেবের চরণে সমর্পণ করা হয়েছিল।

নীরবে পদ্মাবতী সে-কাহিনী শোনে। তার অন্তরে যেন সুদূর কোন্ জন্মান্তর থেকে জেগে উঠতে থাকে বিচিত্র সব আহ্বান। এক নতুন আলোকে সে নিজেকে যেন নতুন করে দেখে।

বেদনাহত পিতাকে আশ্বস্ত করে বলে, এর জন্যে দুঃখ করছেন কেন বাবা ? মেয়ে তো চিরকাল বাপের বাড়ী থাকেনা। দেবতার মন্দিরে আমি দেবদাসী হব, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি আছে ? দেবতা আমাকে চায়, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য !

তারপর একদিন শুভলগ্ন দেখে ব্রাহ্মণ-দম্পতী পদ্মাবতীকে সঙ্গে নিয়ে



পুরীধামে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে আবার উপস্থিত হলো। যথারীতি কন্যাকে জগন্নাথদেবের পায়ে সমর্পণ করে রেখে এলো।

পদ্মাবতী জগন্নাথদেবের মন্দিরে দেবদাসী রূপে জগৎ-নাথের পূজারতি করে। প্রতি রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে, পুষ্পে মাল্যে বরতনুকে ভূষিত করে, নৃত্যে নৃত্যে নিজেকে দেবতার পায়ে করে সমর্পণ। তার সর্ব্ব-অঙ্গে বেজে ওঠে দেবতার আনন্দ-রতি।

ব্রাহ্মণ-দম্পতী কন্যাহীন ঘরে ফিরে না গিয়ে প্রত্যহ সেই মন্দিরের চার-দিকেই ঘুরে বেড়ায়। প্রতি সন্ধ্যায় সাধারণ দর্শকদের মতনই মন্দিরের গর্ভ-গৃহের বাইরে থেকে দেখে, মন্দিরের ভিতর কন্যা আরতি-নৃত্যে বিশ্বনাথকে বন্দনা করছে।

কয়েক দিন পরেই ব্রাহ্মণ আবার স্বপ্ন দেখলো। স্বপ্নে জগন্নাথদেব আবির্ভূত হয়ে বললেন, ব্রাহ্মণ, তোমার সত্য-রক্ষায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার কন্যা সাধারণ মেয়ে নয়। স্বয়ং লক্ষ্মীর অংশে তার জন্ম। এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই তার জন্ম হয়েছে। তোমার কন্যার জন্যেই অপেক্ষা করে আছে কেন্দুবিল্ব গ্রামে এক ব্রাহ্মণ-কুমার, জয়দেব গোস্বামী তার নাম। সেই তোমার কন্যার স্বামী। তারই কাছে নিয়ে যাও তোমার কন্যাকে।

সেই স্বপ্ন থেকে মহানন্দে জেগে ওঠে ব্রাহ্মণ। তৎক্ষণাৎ মন্দিরের প্রধান পাণ্ডার কাছে গিয়ে রাত্রির স্বপ্নের কথা বলে। প্রধান পাণ্ডাও স্বপ্নে অনুরূপ নির্দ্দেশ পেয়েছিলেন। পদ্মাবতীকে সঙ্গে নিয়ে ব্রাহ্মণ কেন্দুবিল্ব গ্রামের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো।

ছয়

অজয়ের ধারে কেন্দুবিল্ব গ্রাম। একমাস পথশ্রমের ফলে ব্রাহ্মণ-কন্যা পদ্মাবতীকে সঙ্গে নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে কেন্দুবিল্ব গ্রামে উপস্থিত হলো। এবং এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি হয়ে উঠলো। পদ্মাবতীর সেই অলোকসামান্য রূপলাবণ্য দেখে গৃহস্থ নিজের কন্যার মতন সমাদর করে তাকে গ্রহণ করলেন। সেইখানে থেকে ব্রাহ্মণ স্বপ্ন-বর্ণিত জয়দেব গোস্বামীর অনুসন্ধান করবার মনস্থ করলে।



ব্রাহ্মণের ধারণা জয়দেব গোস্বামী নিশ্চয়ই কোন বিশেষ ধনী ও সম্ভ্রান্ত কোন বংশের সন্তান হবে, নইলে দেবতার এতখানি অনুগ্রহ-দৃষ্টি কেন তার ওপর থাকবে? কিন্তু প্রথম অনুসন্ধান করতে গিয়েই ব্রাহ্মণ হতাশ হয়ে পড়লো, জয়দেব গোস্বামী বলে কোন পরিচিত ব্যক্তিরই খবর কেউ দিতে পারে না। আশ্রয়দাতা গৃহস্থ যখন ব্রাহ্মণের মুখে শুনলেন যে পদ্মাবতীর সঙ্গে সেই জয়দেব গোস্বামীর বিয়ে দেবার জন্যে তিনি এসেছেন, গৃহকর্ত্তা অবাক্ হয়ে গেলেন। এরকম অসামান্য রূপলাবণ্যবতী কন্যার সঙ্গে নামহীন পরিচয়হীন যুবকের বিয়ে হবে? রাজরাণী হবার যোগ্যা এ কন্যা! নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের সংবাদে কোন ভুল আছে!

কিন্তু ব্রাহ্মণ নিজের মনে জানে, তার সংবাদে কোন ভুলই থাকবার

উপায় নেই। বিশ্বচরাচরের সব সংবাদের যিনি বিধাতা, এ সংবাদ এসেছে তাঁর কাছ থেকেই।

ক্রমশঃ খুঁজতে খুঁজতে ব্রাহ্মণ সন্ধান পেলো জয়দেব গোস্বামীর। বিভিন্ন লোকের মুখ থেকে টুকরো টুকরো যে সব সংবাদ পেলো, তা একত্র করে জয়দেব গোস্বামীর চরিত্র যা দাঁড়ালো, সেই রূপলাবণ্যময়ী কন্যার ভবিষ্যৎ স্বামী-রূপে তাকে কল্পনা করা ব্রাহ্মণের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠলো।

অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত লোকই জয়দেবের পরিচয় জানেন না। নীচ জাতীয় লোকদের কাছ থেকেই তার পরিচয় পাওয়া গেল। কে তার বাবা, কে তার মা, কোন্ বংশের ছেলে, তা কেউ জানে না। চাল নেই, চুলো নেই, পথে ঘাটে, নদীর ধারে, গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

ব্রাহ্মণের মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়লো। থাকবার মত যার সামান্য কুঁড়েঘরও নেই, তার হাতে কন্যা তুলে দেবার জন্যে সে এই দীর্ঘ পথ এত কষ্ট স্বীকার করে এসেছে? হায় জগন্নাথ, এ কি তোমার খেয়াল?

কন্যার ভবিষ্যৎ স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধেও যে বিবরণ সংগ্রহ করলো, তা অনুরূপই ভয়াবহ। কেউ বলে পাগল, কেউ বলে ভিখারী, কেউ বলে লম্পট। কেউ বলতে পারে না সঠিকভাবে কোথায় সে থাকে, বা কি করে। কিন্তু সকলের কথা থেকে যে কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে' ওঠে, তাহলো, পদ্মাবতীর স্বামী হবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এই লোক। এই লোকের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়া আর কন্যাকে হাত-পা বেঁধে সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া একই জিনিস, হয়ত সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া অধিকতর শ্রেয়ঃ, কেন না সে-যন্ত্রণা এক নিমেষের। দুশ্চিন্তায় ব্রাহ্মণের আহার-নিদ্রা ঘুচে গেল।

সাত

যার জন্যে এই দুশ্চিন্তা সে তখন অজয়ের ধারে, জনতা থেকে জনসমাজ থেকে দূরে একা একা ঘুরে বেড়ায়। কোন ঘর নেই তার, কোন ঘরের মায়া নেই তার। অজয়ের জলকল্লোলে শুষ্ক পাতায় কৃষ্ণ-নাম লিখে সে ভাসিয়ে দেয়। বনে বনে গাছের গায়ে গায়ে লেখে কৃষ্ণ-নাম। উন্মাদের মতন হাওয়ায়

হাওয়ায় কাঁদে, কৃষ্ণ হে, কৃষ্ণ হে, কবে দেবে প্রেম···যে-প্রেমে লিখবো তোমার অমর-কাহিনী। যেদিকে যায়, সে দিকেই দেখে সেই নবজলধর শ্যামের শ্যামল ছায়া, যে-নারীর দিকে চায় সেই খানেই দেখে কৃষ্ণ—অন্তর-বাসিনী রাস-রঙ্গিণী শ্রীমতী রাধা। লোকে তাকে উন্মাদ বলে, ভিখারী বলে, তাতে তার কিছু যায় আসে না। সে তো লোককে চায় না, সে তো সমাজকে চায় না, সে চায় অ-লোক আলোককে······রূপকে নয়, সে চায় অরূপকে ধরতে, আকাশকে ধরতে। তার দেহের প্রতি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে কে বাজিয়ে চলেছে অপরূপ এক প্রেমের সুর, সেই প্রেমের সুরে মশগুল হয়ে তার দিন চলে যায়। সে তার সমস্ত চৈতন্য দিয়ে ধরতে চায় সেই প্রেমের উৎসকে, সেই নিত্য-প্রেমের অনন্ত রাস-লীলায় সে হতে চায় সঙ্গী।

যেদিন থেকে তার জেগেছে চেতনা, সে দেখেছে তার চারদিকে, বাংলার সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে চলেছে নারীর দেহকে নিয়ে এক বীভৎস কামলীলা, আখড়ায় আখড়ায়, মোহন্তের সেবাশ্রমে সেবাশ্রমে, তান্ত্রিকদের আড্ডায় আড্ডায়, বৈষ্ণবদের কুঞ্জে কুঞ্জে, ধনীদের উপবনে, সর্ব্বত্র চলেছে প্রেমের নামে কামের নির্লজ্জ ব্যভিচার। বাংলা দেশ ভুলে গিয়েছে প্রেমের স্বর্গীয় বিভব, ভুলে গিয়েছে দেহজয়ী আত্মজয়ী দেহাতীত প্রেমের ঐশ্বর্য্যকে, দেহ-রতি নিয়ে মত্ত হয়ে সে ভুলে গিয়েছে আনন্দ-রতি······গোপিনীদের দেহকে ছাড়িয়ে তারা আর দেখতে পায় না গোপিনীবল্লভ বৃন্দাবন-শ্যামকে।

তাই সেই উন্মাদ তরুণ করেছে চরম-পণ, নিজের জীবনে সে করবে সেই প্রেমের সাধনা। একদিন সর্ব্বস্ব হারিয়ে অশ্রুজলে গোপ-ললনারা যেমন পেয়েছিল সেই প্রেমময়কে সর্ব্বময়-রূপে, তেমনি সে আজ করবে সর্ব্বস্ব হারিয়ে সেই সর্ব্বময়কে পাওয়ার প্রেমসাধনা। যাকে পেলে সব পাওয়া হয়, যাকে ভোগ করলে সব ভোগ করা হয়, সে কি পাবে না তাকে? তাকেই যদি না পাওয়া যায়, তাহলে অন্য সব কিছু পেয়েই বা কি লাভ? তাই তরুণ জয়দেব প্রেমের উন্মাদনায় অজয়ের কূলে কূলে ঘুরে বেড়ায়, অহরহ জপ করে প্রিয়নাম, কৃষ্ণনাম। আর কোন চিন্তা নেই তার, নেই তার আর কোন ভাবনা। তাই প্রতিদিনের জগতের লোক চেনে না তাকে, জানে না তাকে। চিনলেও, চিনে পাগল বলে, ভবঘুরে বলে।

আট

বহু চেষ্টার ফলে ব্রাহ্মণ একদিন অজয়ের ধারে এক গাছের তলায় তরুণ জয়দেবের সন্ধান পেলো। দেখে, গাছতলায় আপনার মনে বসে আছেন, চোখ বুঁজে। ব্রাহ্মণ ভাবে, হয়ত নেশায় বুঁদ হয়ে আছে।

ব্রাহ্মণের ডাকে জয়দেবের চেতনা ফিরে এলো।



ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করে, তুমিই কি জয়দেব গোস্বামী ?

জয়দেব ঘাড় নেড়ে জানান, হাঁ। মনে মনে ভাবেন, এ ব্যক্তি তাঁর নাম জানলো কি করে ? কোন দিনই তো কোন লোক তাঁর সন্ধানে আসে না। এ ব্যক্তি কি প্রয়োজনে এসেছে তাঁর কাছে ?

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করে, তোমার ঘর নেই ?

জয়দেব হেসে বলেন, আমার চেয়ে বড় ঘর কারুরই নেই !

ব্রাহ্মণ উৎসাহে জিজ্ঞাসা করেন, কোথায় ?

জয়দেব বলেন, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড হলো আমার ঘর !

ব্রাহ্মণ বিরক্ত হয়ে বলে, সে ঘরের কথা বলছি না···বাস করবার জন্যে কোন বাড়ী-ঘর-দোর নেই ?

উদাসকণ্ঠে জয়দেব বলেন, আবার বাড়ী-ঘর-দোরের কি প্রয়োজন ?

ব্রাহ্মণ বুঝতে পারে, এ সম্পর্কে আর প্রশ্ন করা বৃথা। তাই অন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, কি করা হয় বাবাজীর ?

জয়দেব বলেন, অপেক্ষা করে আছি ! সেই আমার কাজ !

ব্রাহ্মণ বলে, কার অপেক্ষা করে আছ ?

জয়দেব বলেন, যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আসবে বলে !

ব্রাহ্মণ বলে, কে সে ?

জয়দেব বলেন, সে না এলে, কি করে বলবো, কে সে ? তাকে দেখবো বলেই তো অপেক্ষা করে আছি !

ব্রাহ্মণ ভাবে, এ উন্মাদের সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ নেই। হতাশ হয়ে ফিরে আসে ঘরে, পদ্মাবতীকে সব কথা জানায়।

পদ্মাবতী নীরবে শোনে। বলে, বাবা, আমি যাব তাঁর কাছে !

ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে কন্যার দিকে।

পদ্মাবতী নতমুখে বলে, তিনিই আমার স্বামী !

ব্রাহ্মণ সারারাত বিনিদ্র অবস্থায় ভাবে, একি বিশ্বনাথের খেয়াল ! চাল নেই, চুলো নেই, গাছের তলায় যার আশ্রয়, কপর্দ্দকহীন, তার হাতে এই কন্যাকে কি করে তিনি সমর্পণ করবেন ? এ বিসদৃশ মিলনের ফলে বিধাতার কি উদ্দেশ্যই বা সফল হবে ? সমস্ত শুনে পদ্মাবতীই বা কি রকমে বলতে পারলো, ঐ উন্মাদই তার স্বামী ?

ব্রাহ্মণ দুশ্চিন্তার কোন কূল-কিনারা পায় না।

নয়

সেইদিন রাত্রিতে জয়দেব অবসন্ন দেহে এক গাছতলায় যখন শুয়ে পড়ে ছিলেন, তখন স্বপ্নে শুনলেন, প্রিয়তমের নির্দ্দেশ। কে যেন তাঁর কাণে এসে বল্লো, ওগো ভক্ত, তোমার আকুল ডাকে সাড়া দেবার জন্যেই আমি এসেছি। অজয়ের কূলে কদম্বখণ্ডীর ঘাটে জলের তলায় আমি তোমার অপেক্ষায় আছি, সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসো আমাকে !

প্রভাত না হতেই জয়দেব অজয়ের তীর ধরে ছোটেন কদম্বখণ্ডীর ঘাটের দিকে। উন্মাদের মতন জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন। জলের ভেতর দুহাত বাড়িয়ে খোঁজেন, কোথায় আছে তাঁর ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি।

বহুক্ষণ অজয়ের জলে অবগাহন-অনুসন্ধানের পর সহসা কিসে যেন হাত ঠেকে গেল। ডুব দিয়ে সজোরে সেই বস্তুকে আঁকড়ে ধরে টেনে তুল্লেন, দেখেন, রাধাশ্যামের যুগল মূর্ত্তি, তাঁর ইষ্টদেবতা। সেই রাধাশ্যামের যুগল মূর্ত্তিকে কোলে করে জয়দেব অজয়ের তীরে উন্মাদ নৃত্য করতে সুরু করে দিলেন।

এক কদম্ব গাছের তলায় সেই মূর্ত্তিকে রেখে জয়দেব উল্লাসে আপনার মনে গেয়ে চলেন কৃষ্ণনাম। কোথায় মন্দির, কোথায় আশ্রয়? এক গৃহহীন যাযাবরের কাছে তুমি এলে ঠাকুর, কোথায় কি করে সে করবে তোমার পূজা?

দেখতে দেখতে কদম্বখণ্ডী ঘাটের সেই রাধাশ্যাম বিগ্রহের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। চারদিক থেকে লোক কিসের যেন উন্মাদ আকর্ষণে কদম্বী-খণ্ডীর ঘাটের দিকে ছুটে আসতে লাগলো। কৃষ্ণ-নামে বিভোর জয়দেবের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিরাট জনতা সমস্বরে গেয়ে ওঠে কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণনামে মুখরিত হয়ে ওঠে অজয়ের তীরভূমি। মেলার মতন অনবরত সেখানে আসে যায় জনপ্রবাহ।



সেই বিগ্রহের কথা গিয়ে পৌঁছল বর্দ্ধমানের মহারাজের কাছে। তখন সেই অঞ্চলেই তিনি পরিভ্রমণ কর-ছিলেন। কদম্বখণ্ডীর ঘাটে এসে কৃষ্ণ-নামে উন্মত্ত সেই বিরাট জনতা আর সেই জনতার কেন্দ্র-পুরুষ-স্বরূপ কবি জয়দেবকে দেখে মহারাজের অন্তর ভক্তি-রসে উদ্বেল হয়ে উঠলো। অবিলম্বে তিনি সেই কদম্বীখণ্ডীর ঘাটে রাধাশ্যামের বিরাট মন্দিরের ব্যবস্থা করলেন। রাজানুগ্রহে কয়েক দিনের মধ্যে সেই নির্জ্জন নদীতটে মাথা তুলে উঠলো মন্দির, মন্দিরসংলগ্ন বিরাট চত্বর, অতিথশালা, ভজনালয়। কাল যে ছিল গৃহহীন যাযাবর, আজ তাকে ঘিরে কলগুঞ্জন করে উঠলো শত শত ভক্তের দল; কাল যে ছিল অপরিচিত, অজ্ঞাত, আজ তার নামে মুখরিত হয়ে উঠলো অজয়ের দুই তট।

পদ্মাবতীর পিতা বিস্ময়ে সেই দৃশ্য দেখলেন এবং নিজের অবিশ্বাসের জন্যে নিজেকে শত ধিক্কার দিলেন। ভগবান যে ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন,

তার আবার আশ্রয়ের অভাব কি ? তার আবার ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন কি ? ভগবান নিজেই তার ভার বহন করে থাকেন।

পদ্মাবতীর পিতা সেই পুরাতন সত্যকে আবার নিজের চোখের সামনে সার্থক হয়ে উঠতে দেখলেন। জয়দেবের অপূর্ব্ব ভক্তি দেখে, তাঁর অন্তর-উচ্ছসিত দৈব-সঙ্গীত শুনে, পদ্মাবতীর পিতা নিজে কবির পরম ভক্ত হলেন এবং তাঁর কেন্দুবিল্বতে আসার সমস্ত কাহিনী আনুপূর্ব্বিক জানালেন। জয়দেবের হাত ধরে মিনতি করলেন, বিশ্বনাথের বিধানে তাঁর কন্যাকে গ্রহণ করে ধন্য করতে হবে।

জয়দেব সেই অপরূপ কন্যার কথা শুনে তাকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

সেদিন স্বপ্নে দেখলেন, রাধাশ্যামের যুগল মূর্ত্তিতে শ্রীমতীর অঙ্গ থেকে এক আলোকধারা বিনির্গত হলো। সেই আলোক-ধারা ক্রমশঃ এক নারীমূর্ত্তির রূপ ধরে



জয়দেবের দিকে অগ্রসর হয়ে আসতে লাগলো। ক্রমশঃ জয়দেবের সামনে এসে সেই অসামান্যা-রূপলাবণ্যময়ী নারী মুগ্ধ-দৃষ্টিতে কবির দিকে চেয়ে রইলো। কবি মর্ম্মের চক্ষু দিয়ে সেই মূর্ত্তিকে বহুক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করলেন। ধীরে জয়দেবকে প্রণাম করে সেই মূর্ত্তি আবার পিছন ফিরে ধীরে ধীরে শ্রীমতীর অঙ্গে মিশিয়ে গেল।

সেদিন প্রভাতে ব্রাহ্মণ যখন পদ্মাবতীকে সঙ্গে নিয়ে জয়দেবের কাছে এলেন, জয়দেব বিস্ময়ে দেখেন, এই সেই নারী যাকে স্বপ্নে দেখেছিলেন।

পদ্মাবতী জয়দেবের চরণে নত হয়ে প্রণাম করে।

শুভলগ্নে রাধাশ্যামের বিগ্রহের সামনে জয়দেব অন্তরের সম্রাজ্ঞীরূপে বরণ করে নিলেন পদ্মাবতীকে।

নবপরিণীতার হাত ধরে বল্লেন, তুমি হবে আমার প্রেম-সাধনার সহায়। তোমার প্রেমের মধ্যে আমি যেন নতুন করে পাই আমার রাধাশ্যামের প্রেমকে। তোমার সেই প্রেমে আমি রচনা করবো রাধাশ্যামের অনন্ত প্রেম-লীলা! তুমি হবে আমার প্রেরণা, আমার শ্রীমতী!

দশ

অজয়ের তটে রাধাশ্যামের মন্দিরে জয়দেব নবপরিণীতা বধূকে নিয়ে স্থরু করেন এক অপরূপ প্রেম-সাধনা। সারাদিন চলে যায় রাধাশ্যামের অর্চ্চনায়, পদ্মাবতী সঙ্গীতে নৃত্যে নিত্য করে রাধাশ্যামের আরতি, নৃত্যে সঙ্গীতে ভরিয়ে রাখে স্বামীর অন্তর। জয়দেব রচনা করতে বসেন, শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ কাব্য। এক একটী পদ রচনা করেন আর পদ্মাবতীকে পড়িয়ে শোনান। পদ্মাবতী আবার সঙ্গীতে সেই পদকে মুখর করে তুলে কবিকে শোনায়। সমস্ত জগৎ বাইরে পড়ে থাকে, কবি জয়দেব তাঁর নিজের মনে রচনা করেন নব-বৃন্দাবন, সেখানে অনুক্ষণ প্রেম-লীলা করে চলে রাধামাধব। অন্তরের সেই নিবিড় অনুভূতি ফুটে ওঠে লেখনীর মুখে। কৃষ্ণ-ধ্যান, কৃষ্ণ-জ্ঞান, কৃষ্ণ-চিন্তা, কৃষ্ণ-দর্শন, কৃষ্ণ-কথাতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে কবি জয়দেবের অন্তর। অজয়কে মনে হয় যমুনা বলে, অজয়ের কূলে প্রস্ফুটিত কদম্ব-বৃক্ষকে দেখে মনে পড়ে কেলিকদম্ব; সন্ধ্যারতির সময় পদ্মাবতী যখন সঙ্গীতে নৃত্যে নিজেকে নিবেদন করে রাধাশ্যামের বিগ্রহের কাছে, জয়দেবের চোখের সামনে ফুটে ওঠে, পদ্মাবতীকে আশ্রয় করে স্বয়ং শ্রীরাধিকা। আবেশে আবেগে কবি পদ্মাবতীর চরণে নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে বলেন, হে দেবী, আমি তোমারই চরণচারণ-চক্রবর্ত্তী!

এইভাবে এগিয়ে চলে শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ কাব্য, রাধাকৃষ্ণের মিলন-বিরহ লীলা। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাত কাটিয়ে সর্ব্ব-অঙ্গে নখক্ষত নিয়ে প্রভাতে এসে দাঁড়িয়েছেন কৃষ্ণ-অভিমানিনী শ্রীমতীর কুঞ্জে। সারারাত প্রিয়-আগমন প্রতীক্ষায় বিনিদ্র কেটে গিয়েছে শ্রীমতীর রাত্রি। প্রভাতে তাই কৃষ্ণ যখন এসে দাঁড়ালেন, শ্রীমতী দেখেন রাত্রির কেলি-উন্মত্ততায় শ্রীকৃষ্ণের পরণে রয়েছে পর-নায়িকার

বসন, সর্ব্ব-অঙ্গ পর-নায়িকার সঙ্গে প্রেমবিহারের নখক্ষত চিহ্ন তখনও কুরুবককলির মতন রক্তিম হয়ে রয়েছে। নিদারুণ অভিমানে শ্রীমতী একটীও কথা না বলে দিলেন প্রিয়তমকে বিদায়। তারপর সুরু হলো বিদগ্ধ মাধবের অনুশোচনা। নানাভাবে তিনি শ্রীমতীর মান ভাঙ্গবার জন্যে মিনতি করেন। ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসে শ্রীমতীর মান। উপযাচিকা হয়ে শ্রীমতী সখীদের নিয়ে উপস্থিত হন আবার কৃষ্ণের কুঞ্জদ্বারে। অপগত-মান শ্রীমতীকে দেখে আনন্দ-রসে উদ্বেল হয়ে ওঠে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর। শ্রীমতীকে আলিঙ্গন করে বলেন, তুমি আমার, আমি তোমার, তোমার আমার মধ্যে কোথাও নেই বিচ্ছেদ!

তখনও শ্রীমতীর মুখে কোন কথা নেই। তখন শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কল্প করেন, নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে শ্রীমতীর চরণে আত্মসমর্পণ করতে। লিখতে লিখতে



কেঁপে ওঠে কবির লেখনী। অশ্রু-জলে ঝাপসা হয়ে আসে পুঁথির অক্ষর। কবি লিখছেন, *স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং,* তার পরের কথাটী ভক্তকবি আর লিখতে পারেন না। আবেগে চীৎকার করে ডাকেন, পদ্মাবতী, পদ্মাবতী!

পদ্মাবতী পুঁথির সামনে এসে বসে।

অশ্রু-বিধৌতকণ্ঠে কবি পড়ে শোনান……জগতের সব প্রাণী যাঁকে চায়, তিনি আজ আকুল হয়ে চাইছেন আর একজনকে…নদী ছুটে আসে সাগরের বুকে, আজ সাগর ছুটে চলেছে নদীর কাছে।

"ওগো প্রিয়ে, দূর কর ঐ অকারণ মান। কথা বল, যে তোমার বুকের ভেতর রয়েছে, আলিঙ্গনে তাকে টেনে নাও বুকে।"

আবেগকম্পিতকণ্ঠে কবি পড়েন, স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং…অশ্রুতে রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ, কবি আর পড়তে পারেন না।

পদ্মাবতী, পদ্মাবতী, কেমন করে আমার এই লেখনী দিয়ে লিখবো সে-কথা, বিশ্ব যার চরণে প্রণত, সে আজ চাইছে চরণ ধরতে…

উদ্বেল হয়ে ওঠে ভক্তের অন্তর। লেখনী ফেলে দিয়ে ওঠে পড়েন কবি।

বেলা দ্বিপ্রহর।

পদ্মাবতী বলে, প্রভু, দ্বিপ্রহর হয়ে গিয়েছে, আপনি স্নান সেরে আসুন। তারপর আহার আর বিশ্রামের পর আবার লিখতে চেষ্টা করবেন।…

কবির মনে পড়ে, তাই তো, পদ্মাবতীও অভুক্ত রয়েছেন। তাই নদীতে স্নানের জন্যে বেরিয়ে পড়লেন।

পদ্মাবতী আহারের আয়োজন করতে লাগলো। অল্পক্ষণ পরেই পদ্মাবতী দেখে, স্নান সেরে স্বামী ফিরে এসেছেন।

তাড়াতাড়ি আহারের আয়োজন করে। আহার-অন্তে জয়দেব বলেন, পদ্মাবতী, আমার পুঁথিটা নিয়ে এসো, অসমাপ্ত পদটী সমাপ্ত করে বিশ্রাম করবো।

পদ্মাবতী আনন্দে পুঁথি নিয়ে আসে। জয়দেব অসমাপ্ত পদটী সম্পূর্ণ করে লিখলেন,

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।

তারপর বিশ্রাম করবার জন্যে ঘরের ভেতর প্রবেশ করলেন।

পদ্মাবতী স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট নিয়ে তখন নিজে খেতে বসলো।

এমন সময় দরজায় পদধ্বনি জেগে উঠলো।

পদ্মাবতী সবিস্ময়ে দেখে কৃষ্ণনাম গাইতে গাইতে স্নানান্তে বাইরে থেকে জয়দেব আসছেন!

বিস্ময়ে পদ্মাবতী হতবাক হয়ে যায়। এইমাত্র তো স্বামী স্নান সেরে আহার-অন্তে ঘরে বিশ্রাম করতে ঢুকলেন, কোথা থেকে আবার কি-ভাবে তিনি বাইরে থেকে এলেন ?

জয়দেবও অবাক্ হয়ে গেলেন কারণ তিনি অভুক্ত থাকতে, পদ্মাবতী কি করে খেতে বসলো ?

পদ্মাবতী ছুটে বিশ্রাম-কক্ষে গিয়ে দেখে, ঘরশূন্য, সমস্ত ঘর ভরে শুধু উঠছে পদ্মের আর চন্দনের সৌরভ।

উন্মাদিনীর মতন স্বামীর চরণ-প্রান্তে পড়ে বলে, প্রভু, ধন্য, ধন্য তুমি! তোমার স্পর্শে ধন্য আমিও!



বিস্ময়ে জয়দেব বিহ্বল হয়ে যান।

তখন তাড়াতাড়ি পদ্মাবতী শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দের পুঁথি এনে দেখে, স্পষ্ট অক্ষরে সেখানে লেখা রয়েছে সেই সমাপ্ত পদ, দেহি পদপল্লবমুদারম্!

পদ্মাবতী সমস্ত ঘটনা জয়দেবকে জানায়।

শুনতে শুনতে জয়দেবের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তিনি বুঝতে পারেন, ভক্তবৎসল কৃষ্ণ ভক্তের মর্ম্ম-ব্যথা বুঝতে পেরে, নিজের হাতে লিখে গিয়েছেন, যেকথা লিখতে ভক্তের অন্তর ব্যথিত হয়ে উঠেছিল।

অজয়ের তটে সেদিন মানুষের প্রেমের আকর্ষণে ভগবান্ সশরীরে এসেছিলেন নেমে, তার চিহ্ন রয়ে গেল নিত্যকালের জন্যে গীতগোবিন্দ কাব্যে। মানুষের তৈরী এই মহাকাব্যের ভেতরে তাই আছে অমানুষী দৈব প্রেমের স্পর্শ। তাই গীতগোবিন্দ হলো মানুষের হৃদয়ে দেবতার স্বাক্ষর। তাই কাব্য-সাহিত্যে গীত-গোবিন্দের একটা বিশেষ স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে।

এগার

গীতগোবিন্দ লেখা শেষ হলে, রাধাশ্যামের মন্দিরে জয়দেব গান গেয়ে সেই সঙ্গীত তাঁর অন্তরের ঠাকুরকে প্রথম শুনিয়েছিলেন। সেদিন রাধাশ্যামের মন্দিরে দেশ-দেশান্তর থেকে লোক কবির যশোসৌরভে আকৃষ্ট হয়ে এসেছিল। সেই উৎসব-সভায় পদ্মাবতী সঙ্গীতে আর নৃত্যে স্বামীর কাব্যকে রূপ দিয়েছিলেন, জয়দেব নিজে মৃদঙ্গ বাজিয়ে সঙ্গত করেছিলেন।

সেদিনও বাংলাদেশে সঙ্গীত ও নৃত্যে বাংলার পুরনারীরা বাংলার শিল্পিক ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। তখন দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল না, চারিদিকে ছিল একটা অক্ষুণ্ণ শান্তি। সমাজের মধ্যে ছিল না কোন বৃহৎ কর্ম্ম-প্রেরণা, কোন উৎকট দারিদ্র্যের অঙ্কুশাঘাত। তাই লোকে জীবনের স্বচ্ছন্দধারায় গা ঢেলে দিয়ে একমাত্র কাব্য, নৃত্য, সঙ্গীত আর নাট্যাভিনয়ের ভেতর জীবনের বিচিত্র স্বাদ উপভোগ করবার চেষ্টা করতো।

সমাজ যখন কর্ম্মে শক্তিতে ঐশ্বর্য্যে বিকশিত হয়ে ওঠে, তখন দেখা দেয় সেই সমাজে এক অভূতপূর্ব্ব কাব্য আর শিল্প-প্রতিভা; সমাজ যখন ধীরে ধীরে ভেতর থেকে নির্বীর্য্য হয়ে আসতে থাকে, তার সমস্ত কর্ম্ম-উৎসগুলো শুকিয়ে আসতে থাকে, তখন সেই অবনতির মুখে সমাজে আর একবার দেখা দেয় কাব্য আর সাহিত্য-প্রতিভার উন্মেষ, সমাজের যা কিছু অবশিষ্ট শক্তি তখন কাব্য আর রসানুভূতির মধ্যে খোঁজে আত্মপ্রকাশের পথ।

ঠিক এই অবস্থা তখন দাঁড়িয়েছিল বাংলার সমাজে। ধর্ম্মও তখন বিকৃত হয়ে সমাজের অধোগতিকে সংগোপনে সাহায্য করে চলেছিল। সেনরাজাদের আগে বাংলাদেশ ছিল পালরাজাদের শাসনে। পালরাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। তাই পাল-আমলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসারের ফলে হিন্দুর আচার-ধর্ম্ম শুকিয়ে আসে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মও ক্রমশঃ অন্তঃসার-শূন্য হয়ে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের কঙ্কালে পরিণত হতে থাকে। তারপর সেন আমলে বল্লাল সেন আবার হিন্দুধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেষ্টা করেন। যদিও বাংলার বাইরে থেকে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের নিয়ে বল্লাল সেন বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুত্থানের চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা সার্থক হয়নি।

বৌদ্ধধর্ম্মের সেই প্রতিক্রিয়া থেকে ভাঙ্গনধরা সমাজকে রক্ষা করে তার মধ্যে

নতুন ধর্ম্মোন্মাদনার জোয়ার আনার মত শক্তি বল্লাল সেন বা তাঁর পুত্রের ছিল না। সেকাজের জন্যে দরকার বিরাট পুরুষের, অবতার-পুরুষের। এবং সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত ধর্ম্মের উদার পুনরুত্থান নিয়ে এলেন পরবর্ত্তী যুগে শ্রীচৈতন্য। কবি জয়দেব তাঁর অপরূপ প্রেম-সাধনায় সেই মহাপুরুষেরই আবির্ভাব-পথকে তৈরী করে গেলেন। দেহ-সাধনার ব্যভিচারের মধ্য দিয়ে সমস্ত বাংলাদেশ দেহসর্ব্বস্ব যে অধোগতির পথে অগ্রসর হয়ে চলেছিল, কবি জয়দেব সেখানে দেহাতীত দিব্য প্রেমের আদর্শে সমাজের চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করে তুল্লেন।

বার

কবি জয়দেবের খ্যাতি দেখতে দেখতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো।

প্রত্যেক পূজাপার্ব্বণে জয়দেব পুণ্য-সলিলা গঙ্গায় স্নান করতে যেতেন। দীর্ঘ পথ তাঁকে পায়ে হেঁটে যেতে হতো আবার দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে ফিরতে হতো।

সেবার পৌষ-সংক্রান্তির পুণ্য দিবস সমাগত-প্রায়। জয়দেব প্রত্যেক বৎসর পৌষ-সংক্রান্তি-দিনে গঙ্গাস্নানের জন্যে যাত্রা করতেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেবার পৌষ-সংক্রান্তির আগের দিন শয্যাশায়ী হলেন। ভক্তের মনে নিদারুণ দুঃখ দেখা দিল। তাহলে কি এবার আর গঙ্গাস্নান হবে না? কাতরে গঙ্গাদেবীকে আহ্বান করেন এবং সারাদিন ধরে তাঁর স্তব করেন।

পৌষ-সংক্রান্তির প্রভাতে কেন্দুবিল্ব গ্রামের লোকদের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। অবাক হয়ে তারা দেখে, অজয়ের দুই কূল উপছে এসেছে বন্যা, অজয়ের শাদা জলে এসে মিশেছে গঙ্গার গৈরিক জল। পূর্ব্ববাহিনী স্রোত আজ কোন্ রহস্য-ময়ের ইঙ্গিতে পশ্চিমমুখী হয়ে ছুটেছে।

জয়দেব আনন্দে আত্মহারা হয়ে দেখেন, কদম্বখণ্ডীর ঘাটে বইছে গঙ্গার স্রোত-জল। উন্মাদের মতন সেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন, বলেন, অসীম করুণাময়ী মা, সন্তানের মিনতিতে আজ তুমি এলে বন্যারূপে তার কাছে। জয় মা পতিত-পাবনী, মর্ত্ত্যসুরধুনী!

কদম্বখণ্ডীর ঘাটে গঙ্গার আগমন, হয়ত কিম্বদন্তী কিন্তু এই কিম্বদন্তী থেকে বোঝা যায়, কি প্রগাঢ় ছিল কবি জয়দেবের ভক্তি! তাঁর জীবনের সমগ্র কাহিনী আমাদের জানা নেই কিন্তু এই সব কিম্বদন্তী থেকে তাঁর চরিত্রের যে

আভাস পাওয়া যায়, তা থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, পরবর্ত্তী যুগে শ্রীচৈতন্য বাংলাদেশে প্রেম ও ভক্তির যে নব-উন্মাদনা নিয়ে আসেন, তার স্পষ্ট লক্ষণ ফুটে ওঠে জয়দেবের জীবনে ও সাধনায়। জয়দেবের অলৌকিক প্রেম আর ভক্তি হলো মহাপ্রভুর অগ্রদূতস্বরূপ। তাঁর জীবন ও সাধনার ভেতর দিয়ে তিনি বাংলাদেশকে সেই মহারূপান্তরের প্রস্তুতি দিয়ে গেলেন। গীতগোবিন্দে তিনি যে প্রেমের গান গাইলেন, সেই প্রেমকে জীবনে দিব্য সত্যরূপে ফুটিয়ে তোলবার জন্যেই এলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য।

তের

এইভাবে লোক-মুখে-মুখে জয়দেবের প্রেম ও ভক্তির কাহিনী, তাঁর অপরূপ কাব্য-প্রতিভার কথা গৌড়ের রাজসভায় গিয়ে পৌঁছল।

তখন বল্লালসেন গত হয়েছেন। গৌড়ের সিংহাসনে রাজা লক্ষ্মণ সেন। পিতার কাছ থেকে লক্ষ্মণ সেন পেয়েছিলেন, মহত্তর জীবনের প্রতি একটা সুতীব্র অনুরাগ। বল্লালসেন মৃতপ্রায় বাংলার সামাজিক জীবনকে কৌলীন্যের গুণগত বিভাগে এক নতুন প্রেরণা দিয়ে যান। প্রতিদিনের জীবনের গড্ডলিকা-প্রবাহ থেকে জনতার চিত্তকে তিনি মহত্তর অস্তিত্বের, মহত্তর জীবনের দিকে আকৃষ্ট করেন। পিতার সেই আদর্শবাদ পূরামাত্রায় লক্ষ্মণ সেন পেয়েছিলেন। তাই তিনি বাংলাদেশে সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্পকলার পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারা এক উন্নততর জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন এবং সে-যুগের রীতি অনুযায়ী তিনি নিজেকে কাব্য-সঙ্গীত ও শিল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকরূপে জাহির করেন। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মতন তাঁর মনে এক সুতীব্র বাসনা জেগে ওঠে, তাঁর রাজসভায় তিনি দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাদের স্থান দেবেন। তাই দেখি, তাঁর সভায় সে-যুগের বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিদের সম্মেলন। এইভাবে দেখি তাঁর রাজ-সভায় কবি উমাপতি ধর, গোবর্দ্ধন আচার্য্য, কবি শরণ ও কবি ধোয়ী এবং কবি জয়দেব মিশ্র। এই বিদ্বৎমণ্ডলীর মধ্যে কবি জয়দেবের নামের সঙ্গেই আমরা সবিশেষ পরিচিত। বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাসের মতন, লক্ষ্মণ সেনের রাজ-সভায় কবি জয়দেবের নাম ও কীর্ত্তিই তাঁর রাজসভাকে অমর করে রেখেছে।

একান্ত দুঃখের বিষয়, বাংলার এই সব শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভাদের দান আজ কালগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। কবি উমাপতি ধর লক্ষ্মণ সেনের সভা-কবিদের মধ্যে সব চেয়ে বয়সে প্রবীণ ছিলেন। তিনি বল্লাল সেনের আমলের লোক এবং কিছুকাল তাঁর মন্ত্রিত্ব পর্য্যন্ত করেছেন। গোটাকতক টুকরো টুকরো কবিতা ছাড়া তাঁর সৃষ্টির আর কিছু পাওয়া যায় না। কবি জয়দেব তাঁর সমালোচনা করে বলেছিলেন, বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ অর্থাৎ কবি উমাপতি ধরের একটা বিশেষ লক্ষণ ছিল যে, তিনি শব্দের ওপর বড় বেশী নজর দিতেন, তাঁর কাব্য-প্রতিভার লক্ষ্য ছিল, শব্দকে পল্লবিত করে তোলা।

লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় কবি-প্রতিভাতে যেমন কবি জয়দেবের স্থান ছিল অগ্রগণ্য, তেমনি তেজস্বিতায় এবং পাণ্ডিত্যে প্রধান স্থান ছিল গোবর্দ্ধন-আচার্য্যের। তাঁর নির্ভীকতার কতকগুলি গল্প প্রচলিত আছে। সেই সব গল্প থেকে বোঝা যায়, তখনও ব্রাহ্মণের তেজ, ন্যায়নিষ্ঠা, তাঁর সত্যবাদিতা রাজার আসনকে পর্য্যন্ত টলিয়ে দিতো। কবি জয়দেবের সমসাময়িক সমাজের চিত্র-স্বরূপ গোবর্দ্ধন আচার্য্যের একটী কাহিনী বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

চৌদ্দ

সেকালের রীতি-অনুযায়ী রাজা লক্ষ্মণ সেনও বহুবল্লভ ছিলেন। তাঁর অনেক-গুলি মহিষী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন প্রিয়মহিষী ছিলেন বল্লভা। রাণী বল্লভার এক ভাই ছিল, নাম কুমারদত্ত।

কুমারদত্ত যেমন অত্যাচারী, তেমনি ছিল লম্পট। বহু বিধবার, বহু তরুণীর অভিশাপ সে জীবন ভরে কুড়িয়ে বেড়ায়। প্রিয়মহিষীর ভ্রাতা বলে, কেউ আর সাহস করে রাজদ্বারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারতো না। রাণী বল্লভা স্নেহান্ধ হয়ে এই দুর্বৃত্ত ভ্রাতার সমস্ত অপরাধকে ঢেকে রাখতেন।

কিন্তু একদিন বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটে গেল। কুমারদত্ত মাধবী নামে এক বণিকপত্নীর ওপর অত্যাচার করতে যায়। কিন্তু মাধবী জোর করে সেই দুর্বৃত্তের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় এবং চীৎকার করে লোকজনকে ডাকে। সেই চীৎকারে রাজপ্রহরীরা সেখানে এসে উপস্থিত হয়। মাধবী তাদের সামনে কুমারদত্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। কিন্তু রাজপ্রহরীরা

কুমারদত্তকে ধরবার কোন চেষ্টাই করলো না। কুমারদত্ত মাধবীকে শাসিয়ে বীর-দর্পে চলে গেল।

মাধবী কিন্তু নীরবে এই অপমান সহ্য করলো না। অভিযোগ নিয়ে স্বয়ং রাজসভায় গিয়ে উপস্থিত হলো এবং রাজাকে আহ্বান করে বল্লো, আপনি রাজা, দেশের রক্ষক। আমি আপনার কাছে বিচার-প্রার্থী।

ওধারে কুমারদত্ত গিয়ে রাণী বল্লভাকে খবর দিতে, রাণী বল্লভা পর্দ্দার আড়ালে রাজসভার পেছনে এসে দাঁড়ালেন।

মাধবী সর্ব্বসমক্ষে কুমারদত্তের অত্যাচারের সমস্ত বিবরণ দিলো। সেই অত্যাচারের কাহিনী শুনে ব্রাহ্মণ গোবর্দ্ধন আচার্য্য ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠলেন।

রাণী বল্লভা পর্দ্দা সরিয়ে রাজসভায় এসে মাধবীকেই উল্টে দুশ্চরিত্রা বলে গালাগালি দিয়ে উঠলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে মাধবীর চুল ধরে টানতে টানতে তাকে ভেতরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন।

গোবর্দ্ধন আচার্য্য তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে হাতের দণ্ড তুলে রাণীর পথ আগলে দাঁড়ালেন এবং রাজাকে সম্বোধন করে বল্লেন, আপনি যদি এই মুহূর্ত্তে পাপিষ্ঠ কুমারদত্তের উপযুক্ত শাস্তির বিধান না করেন, তা হলে আমি অভিশাপ দিতে দিতে আপনার এই পাপ-সভা পরিত্যাগ করে চল্লাম।

রাজা লক্ষ্মণ সেন তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের হাত ধরে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করলেন এবং তদ্দণ্ডেই কুমারদত্তের নির্ব্বাসন-দণ্ড বিধান করলেন।

অপর দুজন কবির মধ্যে ধোয়ী কবির একখানি সমগ্র কাব্য এখনও প্রচলিত আছে। কালিদাসের অনুকরণে তিনি পবনদূত লেখেন।

কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের রত্নসভার উজ্জ্বলতম রত্ন ছিলেন জয়দেব কবি। তাঁর এবং তাঁর সুযোগ্যা পত্নী পদ্মাবতীর সঙ্গীত ও কাব্য-প্রতিভা সম্বন্ধে একটী অপরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনী হলেও, তা থেকে বোঝা যায়, এই কবি-দম্পতী কি অসাধারণ প্রতিভারই অধিকারী ছিলেন। জয়দেব তাঁর কাব্যে প্রকাশ্যভাবে যেভাবে পদ্মাবতীর জয়গান গেয়ে গিয়েছেন, যেভাবে পৃথিবীর কাছে নিজের নামের সঙ্গে পত্নীর নামকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে গিয়েছেন, তার ভেতর থেকে যেমন ফুটে উঠেছে কবি-পত্নীর প্রতি কবির অসাধারণ প্রেম, সেই সঙ্গে ফুটে

উঠেছে পদ্মাবতীর অসামান্য প্রতিভার স্বীকৃতি। জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের পত্নীরা স্বামীর প্রতিভার সমভাগিনী ক্বচিৎ হন। কিন্তু কবি জয়দেবের ভাগ্যে যে পত্নীলাভ ঘটেছিল, সে-নারী ছিলেন সে-যুগের বর-নারীদের মধ্যে সঙ্গীতে নৃত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। পদ্মাবতীর জীবন ও চরিত্র থেকে বোঝা যায়, সে-যুগে বাংলাদেশে নারীর স্থান ছিল কতখানি অকুণ্ঠ। নারী ছিল সমাজের সৌন্দর্য্য ও রস-বোধের প্রধান উৎস। তার হাতে তখন খুন্‌তী আর হাঁড়ি ছিল না শুধু, ছিল বীণা। তার স্থান ছিল না শুধু রান্নাঘরে আর অন্তঃপুরে, তার স্থান ছিল সমাজের হৃদ্‌-কেন্দ্রে। রস-চর্চ্চার ক্ষেত্রে সেদিনও নারী ছিল বাংলার পুরুষ-প্রতিভার সহযাত্রী।

পনের

আজ যেমন বাংলাদেশে নট-বৃত্তি সামাজিক নিন্দার অন্ধকার-স্তরে নেমে গিয়েছে, সেদিনের বাংলাতে কিন্তু তা ঘটেনি। সেদিনকার বাংলায় নটবৃত্তি ছিল সামাজিক গৌরবের বস্তু এবং শুধু পুরুষ নয়, নারীও এই নটবৃত্তি সগৌরবে গ্রহণ করতো।



লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় চলেছে রসের উৎসব। সুবিখ্যাত নট গাঙ্গো তাঁর পুত্রবধূ বিদ্যুৎপ্রভাকে নিয়ে এসেছেন সেই গুণী-সভায়। গাঙ্গো নিজে প্রতিভাশালিনী পুত্রবধূকে সঙ্গীতে ও নৃত্যে শিক্ষা দিয়েছেন। রাজসভায় বিদ্যুৎপ্রভা আলাপ করছেন সুহই রাগ।

রাজসভার পাশেই ছিল রাজ-নির্ম্মিত এক কূপ। চারদিককার পুরললনারা সেই কূপ থেকে জল নিয়ে যেতেন। বিদ্যুৎপ্রভা যখন সঙ্গীত আলাপ করছিলেন, সেই সময় এক গৃহস্থ বউ কোলে শিশুপুত্রকে নিয়ে কূপ থেকে জল নিতে

এসেছিল। বিদ্যুৎপ্রভার গান শুনে বিমুগ্ধ হয়ে সেই নারী কাঁখের কলসীর বদলে কোলের শিশুকে কূপের জলে অন্যমনস্কভাবে নামিয়ে দেয়।

বিদ্যুৎপ্রভার গান শেষ হলে গাইতে আরম্ভ করলেন বুঢ়ন মিশ্র······উড়িষ্যা থেকে নিমন্ত্রিত হয়ে লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় এসেছেন, ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক। বুঢ়নমিশ্র ধরলেন পটমঞ্জরী রাগ। গানের সুর আগুনের হল্‌কার মতন বাতাসে ভেসে বেড়ায়। গান শেষ হলে দেখা গেল, রাজসভার দ্বারে যে সব শোভা-বৃক্ষ ছিল, তার পাতা সব ঝরে গিয়েছে। রাজসভার মধ্যে ধন্য ধন্য রব উঠলো। সকলে একবাক্যে বলে উঠলেন, বাংলাদেশে এঁদের যোগ্য শিল্পী আর নেই, সুতরাং এঁদের দুজনকেই জয়পত্র দেওয়া উচিত।

সেই সময় পদ্মাবতী পথ দিয়ে স্নানে যাচ্ছিলেন, তিনি শুনলেন বাংলার বাইরে থেকে দুজন গায়ক এসে রাজার হাত থেকে জয়পত্র নিয়ে যাচ্ছেন। পদ্মাবতী রাজসভায় প্রবেশ করে রাজাকে শ্রদ্ধাসহকারে নমস্কার করে বল্লেন, রাজা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়ক বা গায়িকার জন্যে আপনার জয়পত্র। বাংলাদেশে এদের চেয়ে যোগ্যতর গায়ক আছে!

সকলেই অবাক হয়ে পদ্মাবতীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

লক্ষ্মণ সেন জিজ্ঞাসা করেন, হে কল্যাণী, কে সে গায়ক বা গায়িকা?

তখন পদ্মাবতী বলেন, বাংলাদেশ থেকে জয়পত্র নিয়ে যেতে হলে আমি ও আমার স্বামী কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেবকে সঙ্গীতে পরাজিত করতে হবে!

তখনি মহাসমাদরে রাজা পদ্মাবতীকে গানের আসরে আহ্বান করলেন। পদ্মাবতী গান্ধার রাগ ধরলেন। সেই সুরের আকর্ষণে গঙ্গার অপর তীর থেকে নৌকো সব এ-তীরে এসে লাগলো। তখন সভাসদেরা বল্লেন, পদ্মাবতীর সুরের মায়াই বেশী, কারণ সম্পূর্ণ নির্জীব নৌকোকে তা আকর্ষণ করে নিয়ে এসেছে। জয়পত্র পদ্মাবতীরই পাওয়া উচিত।

তাতে বুঢ়ন মিশ্র রেগে গিয়ে বল্লেন, স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাই না।

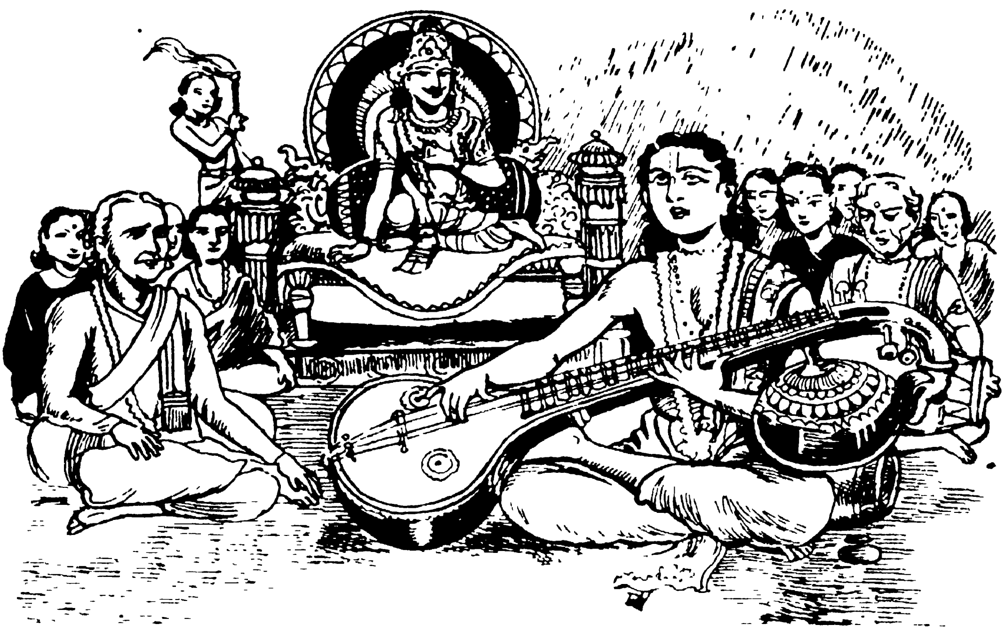
ইতিমধ্যে রাজার আহ্বানে কবি-শ্রেষ্ঠ জয়দেব রাজসভায় উপস্থিত হলেন। সমস্ত ব্যাপার শুনে বল্লেন, বুঢ়ন মিশ্রের এমন কিছু কৃতিত্ব তো আমি দেখতে পাচ্ছি না, বসন্তকালে এমনিই তো গাছের পাতা ঝরে যায়।

বুঢ়ন মিশ্র প্রতিবাদ করেন, কিন্তু একই সময় সব পাতা ঝরে পড়ে না। দিনে দিনে, প্রহরে প্রহরে ঝরে পড়ে। আমার গানে তা নিমেষেই সাধিত হয়েছে।

জয়দেব বলেন, তাহলে উনি গান গেয়ে ঐ ঝরা-পাতা-গাছে আবার নতুন পাতাকে নিয়ে আসুন!

বুঢ়ন মিশ্র বলেন, তা অসম্ভব!

জয়দেব তখন বীণা তুলে নিয়ে বসন্তরাগ ধরলেন। বসন্তরাগের আলাপের



সঙ্গে সঙ্গে শুকনো গাছের ডালে আবার নতুন সবুজ পাতার অঙ্কুর জেগে উঠলো।

বুঢ়ন মিশ্রের মাথা হেঁট হয়ে গেল। লক্ষ্মণ সেন সিংহাসন থেকে নেমে এসে কবি জয়দেবের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন জয়পত্র। বল্লেন, হে শিল্পী, হে কবি, আজ থেকে লক্ষ্মণ সেনের সভা তোমাকে পেয়ে ধন্য হলো!

অবশ্য এই সব হলো কাহিনী। কিন্তু এই কাহিনী থেকে বোঝা যায়, জয়দেব আর পদ্মাবতী কত বড় শিল্পী ছিলেন। জয়দেব গান গাইতেন আর পদ্মাবতী তাঁর সঙ্গে মৃদঙ্গ বাজাতেন। জয়দেব-পদ্মাবতীর প্রেম সঙ্গীত

আর কাব্যের মধ্যে তাই অমর হয়ে আছে। তাই জয়দেব তাঁর অমর কাব্যে বারেবারে নিজেকে পদ্মাবতীচরণ-চারণ কবি বলে পরিচয় দিয়ে ধন্য হয়েছেন।

বাংলার রস-লোকে তাই গীত-গোবিন্দ-রচয়িতা কবি জয়দেব মন্দার সৌরভে বিরাজ করছেন। তাঁর অন্তরে ছিল যে নিবিড় প্রেম, রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলার বর্ণনার ভেতর দিয়ে তা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। এবং এমন ভাবে মূর্ত্ত হয়েছে যে, গীত-গোবিন্দের মত রসাল কাব্য জগতে দুর্লভ বল্লেই হয়।



কবি জয়দেব
গীতগোবিন্দ



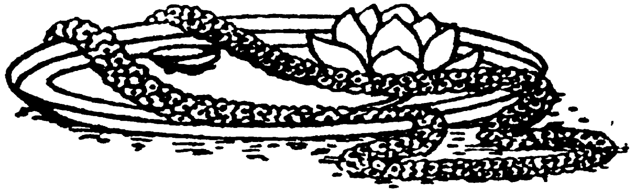
প্রথম সর্গ
সামোদ দামোদর

প্রথম সর্গ

সামোদ দামোদর

ভূমিকায় শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ-কাব্যের আলোচনায় এই কাব্যের সর্গ-বিভাগ সম্বন্ধে লিখেছি যে, কবি জয়দেব এই কাব্যখানিকে বারোটি সর্গে বিভক্ত করেছেন। প্রত্যেক সর্গের তিনি একটা স্বতন্ত্র নাম দিয়েছেন। এই নামকরণের ভিতর দিয়েও জয়দেবের অপরূপ ভাষা-শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক নামটি একটা অনুপ্রাস এবং শব্দ-ঝঙ্কার আর লালিত্যের দিক থেকে প্রত্যেকটি নাম অপরূপ।

কিন্তু শুধু অনুপ্রাস আর শব্দ-লালিত্যের দিক থেকেই জয়দেব এই সব নামকরণ করেননি। প্রত্যেক সর্গের বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে নামের অপূর্ব্ব ভাব-সংযোগ রয়েছে। প্রথম সর্গের নাম সামোদ-দামোদর। কারণ, এই সর্গে কবি দেখাচ্ছেন, কৃষ্ণ-প্রেম-আকুলা শ্রীমতী ব্যাকুলা হয়ে সর্ব্বত্র কৃষ্ণকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সেই সময় তাঁর এক প্রিয় সখী তাঁকে দেখিয়ে দিল যে, তাঁর দামোদর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আজ অন্য নায়িকার সঙ্গে আমোদ করছেন। তাই কবি এই সর্গের নামকরণ করেছেন, সামোদ-দামোদর।



মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর্নক্তং
ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দ-নিদেশতাশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ ॥ ১ ॥



মেঘেতে মেদুর আকাশ,
তাল-তমালে শ্যামা বনভূমি,
নামে ঘন-রাত্রি,
ওগো রাধা,
প্রণয়-ভয়-ভীত শ্রীকৃষ্ণকে
তুমি সঙ্গে করে পৌঁছে দিয়ে এসো
গৃহে।

নন্দের এই নিবেদনে
রাধা-মাধব আজ দুজনে
নিভৃতে হলো মিলিত
যমুনার কূলে পথ-তরু-মূলে
জয় হোক্
রাধা-মাধবের এই প্রেম-খেলা ॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দের এই প্রথম শ্লোক নিয়ে আজ পাঁচশো বছর ধরে কত না রসিকজন, কত না পণ্ডিত কত না বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন।

কবি জয়দেব গীতগোবিন্দ কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের বাসন্তী রাস-লীলা বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে কোথা থেকে এলো এই বর্ষার চিত্র? কাব্যে আরম্ভেই কেন এই বর্ষার নিবিড় রাত্রির বর্ণনা? এবং তার মধ্যে কোথা থেকেই বা এলেন গোপ-রাজ নন্দ? নন্দই বা রাধাকে কেন আদেশ করছেন শ্রীকৃষ্ণকে গৃহে পৌঁছে দিতে?

এই শ্লোক নিয়ে পূজ্যপাদ পূজারী গোস্বামী থেকে আরম্ভ করে বহু বৈষ্ণব আচার্য্য বহু ব্যাখ্যা করেছেন। তার ভেতর থেকে একটি ব্যাখ্যা মনে হয় সকল দিক থেকেই সমীচীন। তাই সেই ব্যাখ্যাই এখানে দেওয়া হলো।

রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলার কাব্য লিখতে বসে, পরম বৈষ্ণব জয়দেব স্বভাবতঃই রাধা-কৃষ্ণের এই প্রেম-লীলার গূঢ়-তত্ত্বের কথা ভেবেছিলেন। তিনি তাঁর কাব্যে যে অপরূপ প্রেম-লীলার বর্ণনা করবেন, সাধারণ মানুষ যেন মনে না করে যে, এই প্রেম সাধারণ মানুষের কাম-কেলি। রাধা-কৃষ্ণের এই প্রেম-লীলা অনন্ত প্রকৃতির সঙ্গে অনাদি পুরুষের নিত্য লীলা। তার বাইরের দিকটা হলো মানবীয়, তার ভেতরের দিকটা হলো আত্মিক। কাব্যের আরম্ভেই তাই বৈষ্ণব কবি সেই কথা পাঠক-পাঠিকাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান এবং সেইজন্যেই সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ জয়দেব ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে যেখানে রাধা-কৃষ্ণের এই অতিমানবীয়তার স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে, সেই কাহিনীকে অবলম্বন করেই এই শ্লোক রচনা করেছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের ১৫ অধ্যায়ে রাধা-কৃষ্ণের আসল পরিচয় কি, তাঁদের আসল সম্পর্ক কি, তার কাহিনী বলা হয়েছে এবং গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের বর্ষা-বর্ণনা, নন্দ-নির্দ্দেশ, সমস্তই সেখানে দেখতে পাওয়া যায়।

কাহিনীটি হলো এই,

একদিন গোপরাজ নন্দ বালক কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবনে ভাণ্ডীরবনে গরু চরাতে বেরিয়েছিলেন। বালক কৃষ্ণকে তিনি একদণ্ড কাছ-ছাড়া করতে পারতেন না। গোচারণ করতে করতে ক্লান্ত হ'য়ে নন্দ বালক শ্রীকৃষ্ণকে নিজের হাতে খাওয়ালেন এবং গাছের তলায় বিশ্রামের জন্যে শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করতে লাগলেন। সেই সময় চিরকিশোর শ্রীকৃষ্ণরূপী নারায়ণ নন্দকে তাঁর আসল বিভূতি দেখাবার

সঙ্কল্প করলেন। তিনি বাইরে বালকরূপী হলেও, তিনি চিরকিশোর ; তিনি মানবদেহ ধারণ করেছেন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সেই বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্যেই তিনি বৃন্দাবনে প্রেম-লীলা করবেন, এই কথা তিনি নন্দকে বোঝাতে চাইলেন। সেইজন্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মায়া-প্রভাবে হঠাৎ আকাশে বর্ষার ঘন মেঘের উদয় করালেন, দেখতে দেখতে বনভূমি ঘোর অন্ধকার হ'য়ে গেল, আকাশে বিদ্যুৎ চমকিয়ে উঠলো, ঘন ঘন বজ্রের শব্দে অরণ্য চকিত হয়ে উঠলো। প্রবল ধারায় বৃষ্টি পড়তে সুরু হয়ে গেল। তখন নন্দরাজ ভীত হয়ে উঠলেন, একদিকে বর্ষা-সন্ত্রস্ত সমস্ত গাভী, আর একদিকে বালক শ্রীকৃষ্ণ। কোন্ দিক তিনি সামলাবেন ? শ্রীকৃষ্ণ তখন মায়ার খেলাকে দৃঢ় করবার জন্যে বালকের মতন ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে নন্দের কণ্ঠ আঁকড়ে ধরলেন। নন্দ ভীত-আর্ত্ত অসহায় হ'য়ে মনে মনে জগদম্বাকে ডাকতে লাগলেন।

এমন সময় নন্দ দেখেন, সেইদিকে শ্রীমতী রাধা এগিয়ে আসছেন। হঠাৎ সেই নির্জ্জন বনে, সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থার মধ্যে রাধার এই অকস্মাৎ আগমনে নন্দ উল্লসিত হয়ে উঠলেন। সেই সময় নন্দের মনে মহামুনি গর্গের কথা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। একদা মহামুনি গর্গ বলেছিলেন, শ্রীমতী রাধা হলেন স্বয়ং নারায়ণী, লক্ষ্মীস্বরূপা এবং বালক শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ণ।

সেই কথা মনে উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নন্দ ক্রন্দন-পরায়ণ ভয়-ভীত শ্রীকৃষ্ণকে রাধার নিকটে দিয়ে বল্লেন, আমি বুঝতে পেরেছি দেবী, তুমি নারায়ণী···তাই তোমার হাতেই তোমার প্রিয়-ধনকে সমর্পণ করলাম···তুমি নির্ব্বিঘ্নে শ্রীকৃষ্ণকে গৃহে নিয়ে যাও।



বাগ্দেবতাচরিতচিত্রিত চিত্তসদ্মা
পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী ।
শ্রীবাসুদেবরতিকেলিকথাসমেত
মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্ ॥ ২ ॥

অন্তরে যার আঁকা আছে
বাগ-দেবতার চরিত-চিত্র,
পদ্মাবতীর চরণের যে চারণ-কবি,
সেই জয়দেব,
আজ চলেছে গাইতে
বাসুদেবের রতি-রঙ্গ-কথা ॥ ২ ॥

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্ ।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্ ॥ ৩ ॥

যদি হরি-স্মরণে
সরস হয়ে ওঠে মন,
জাগে কৌতূহল
প্রেম-মাধুরীর লীলা জানতে,
শোন তবে জয়দেবের এই গীত-ভারতী,
মধুর, কোমল, কান্ত যার পদাবলী ॥ ৩ ॥

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তর সৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্য গোবর্দ্ধন-
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ ॥ ৪ ॥

কবি উমাপতিধর ভাষাকে করেছেন পল্লবিত ;
শরণ-কবির আছে মহাসম্পদ
অনায়াসে দ্রুত রচনা করে চলেন দুরূহ সব পদ ;
আচার্য্য গোবর্দ্ধন স্বল্প কথার ফুলে
গাঁথেন প্রেমের মন্দারমালা, অনবদ্য ;
ধোয়ী কবি জন্ম থেকেই শ্রুতিধর ;
তাঁরা প্রত্যেকেই আলো করে আছেন
কাব্যের এক-একটা দিক,
কিন্তু সব দিক নিয়ে সম্পূর্ণ এই কাব্য
রচনা করলেন কবি জয়দেব ॥ ৪ ॥

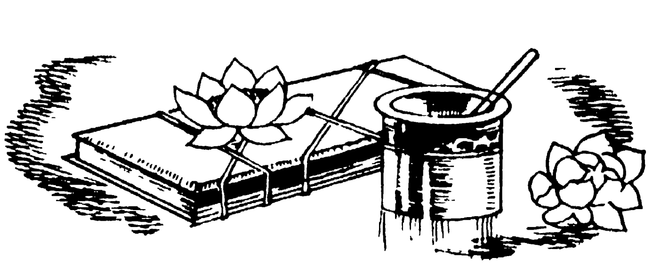
কবি জয়দেব তাঁর সমসাময়িক কবিদের কথা এখানে উল্লেখ করছেন।

জয়দেব ছিলেন তখনকার বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেনের প্রধান সভাকবি। লক্ষ্মণ সেন অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর রাজসভায় তিনি দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিদের নিয়ে এসে সম্মানের স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর সভায় পাঁচজন সভাকবি ছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই সে-যুগের এক-একজন শ্রেষ্ঠ কবি। একটি শিলা-লিপিতে সেই পাঁচজন কবির নাম পাওয়া গিয়েছে, নবদ্বীপের রাজ-দরবারের দ্বারে এই শ্লোকটি লেখা ছিল,

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ ॥"

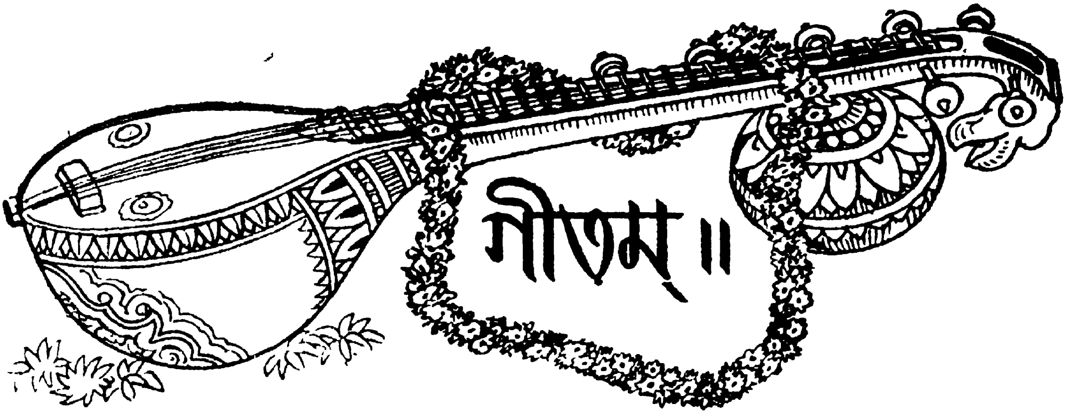
"রাজা লক্ষ্মণ সেনের আছে এই পঞ্চরত্ন—গোবর্দ্ধন, শরণ, জয়দেব, উমাপতি ও কবিরাজ ধোয়ী।" এই পাঁচজন কবিরই কিছু কিছু রচনা আজও পর্য্যন্ত সৌভাগ্যবশতঃ পাওয়া যায়। তার মধ্যে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং ধোয়ী কবির পবনদূত বিশেষ বিখ্যাত।

এই শ্লোকে জয়দেব তাঁর সতীর্থ আর চারজন কবির কথা উল্লেখ করে বলছেন, যে, তাঁরা প্রত্যেকেই কাব্যের এক একটা দিককেই প্রধানতঃ অবলম্বন করে কাব্য লিখেছেন। উমাপতিধরের বিশেষত্ব হলো, শুধু শব্দের মিষ্টতার দিকে, অনুপ্রাস ও অন্যান্য অলঙ্কারের সাহায্যে তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টা করেন শ্রুতিমনোহর বাক্য রচনা করতে কিন্তু তাতে করে কাব্যের অন্য গুণগুলো তাঁর কবিতায় কম থাকে। শরণ কবির বিশেষত্ব হলো, তিনি দুরূহ বিষয় নিয়ে অতি দ্রুত লিখতে পারেন। কিন্তু তাতে তো কাব্যের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় না। তেমনি আচার্য্য গোবর্দ্ধনের গুণ হলো, তিনি শৃঙ্গার অর্থাৎ প্রেম-রস নিয়ে কাব্য লেখেন এবং কি করে পরিমিত কথায় প্রেম-রসকে দূষিত না করে কাব্য লেখা যায়, তা তিনি জানেন। কিন্তু তার ফলে তাঁর রচনায় শব্দের ঝঙ্কার আর লালিত্য তেমন ফুটে ওঠে না। ধোয়ী কবির গুণ হলো, তিনি শ্রুতিধর অর্থাৎ যা একবার কাণে শুনবেন, তৎক্ষণাৎ তা লিখতে পারেন। কিন্তু তাতে মৌলিকতা থাকে না। সেইজন্যে জয়দেব বলছেন, তাঁদের প্রত্যেকের সেই সব খণ্ড খণ্ড বৈশিষ্ট্য তাঁর এই কাব্য-রচনায় তিনি একত্রিত করেছেন, যার ফলে এই কাব্য সকল দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ও শুদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর এই কাব্য যেমন শৃঙ্গার-রস-প্রধান, তিনি তেমনি চেষ্টা করেছেন পরিমিত কথার ভেতর দিয়ে বিশুদ্ধ প্রেমরসকে পরিবেশন করতে এবং তার জন্যে শব্দের মাধুর্য্য বা লালিত্য কোথাও হানি হতে দেননি, বা নিজের মৌলিকতাকেও ক্ষুণ্ণ করেন নি। কবি জয়দেবের এই উক্তি যে নিছক কবি-দম্ভ নয়, তার সাক্ষী গীতগোবিন্দের প্রত্যেকটি শ্লোক। এমন মধুর শব্দ-ঝঙ্কার, অল্প কথার মধ্যে এমন ব্যঞ্জনা, জগতের সাহিত্যে দুর্লভ।





কেশবধৃত মীনশরীর জয় জগদীশ হরে (মৎস-অবতার)



প্রলয়-পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্ ।✿।
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদম্ ॥✿।✿।✿।
কেশব ধৃত-মীনশরীর জয় জগদীশ হরে ॥১॥

প্রলয়ের কালে
সাগরের জলে
ভেসে গিয়েছিল যবে ধরণী,
তরণীর মত,
হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি,
রক্ষা করেছিলে বেদকে,
মীনরূপ ধরে, তুমি
তোমারই হউক জয় ॥ ১ ॥

অতঃপর জয়দেব সঙ্গীতে ভগবানের দশ-অবতার-রূপের বর্ণনা করছেন। একদা মহাপ্রলয়ে সাগরের জলে পৃথিবীর যা কিছু সম্পদ তা ভেসে অতলে চলে গিয়েছিল। সেই প্রলয়ের জলে বেদও ভেসে চলেছিল। তখন ভগবান সাগরে মৎস্যমূর্ত্তি ধারণ করে সেই নিমজ্জবান বেদকে নিজের পিঠে রক্ষা করেন। তার ফলে প্রলয়-অন্তে মানুষ আবার বেদ-ধর্ম্মের সন্ধান পায়। পূজ্যপাদ পূজারী গোস্বামী বলেন, জয়দেব এই দশ-অবতারের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে দশটী বিভিন্ন রসের আধার-স্বরূপ শ্রীহরিকে বর্ণনা করছেন, কারণ তিনি হলেন সর্ব্ব-রসের আধার। মৎস্যরূপের মধ্যে রয়েছে বীভৎস রস। গোস্বামী ঠাকুর বলেন, এক একটী রূপ হলো এক একটী রসের প্রতীক।



ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে ।❀।
ধরণি-ধারণ-কিণচক্র-গরিষ্ঠে ॥ ❀ । ❀ ।
কেশব ধৃত-কূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে ॥৬॥

অতি বিপুল তোমার পৃষ্ঠে
কূর্ম্মরূপে
তুমি একদা ধারণ করেছিলে ধরণীকে।
তাই ধরণীর ভারে কঠিন ব্রণ-চিহ্নে
অঙ্কিত হয়ে যায় তোমার পৃষ্ঠদেশ,
কূর্ম্ম-মূর্ত্তিধারী হে কেশব,
হে জগদীশ, হে শ্রীহরি,
তোমারই হউক জয় ॥ ৬ ॥

ভগবান কূর্ম্মমূর্ত্তি ধরে পৃথিবীকে নিজের পিঠে বহন করেন, যাতে পৃথিবী প্রলয়ের জলে নিমজ্জিত না হয়ে যায়। পূজারী গোস্বামীর ব্যাখ্যায় কূর্ম্মমূর্ত্তি হলো অদ্ভুত রসের প্রতীক।

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না।
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না ॥
কেশব ধৃত-শূকররূপ জয় জগদীশ হরে ॥৭॥

তোমার দশন-শিখরে
ধরণী যেদিন লগ্না হয়েছিল
চাঁদের কলঙ্কচিহ্ন সম,
সেদিন তোমার ছিল বরাহ মূর্ত্তি,
হে কেশব, হে জগদীশ, হে শ্রীহরি,
তোমারই হউক জয় ॥ ৭ ॥

সৃষ্টির আদিম কালে আর একবার সমস্ত বিশ্ব প্রলয়ের জলে ভেসে যায়। দিনী দেবী ভীতা হয়ে রসাতলে পালান। তখন ভগবান বরাহমূর্ত্তি ধারণ ক'রে রসাতল থেকে মেদিনীকে নিজের দন্তের ওপর ধারণ ক'রে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। বরাহমূর্ত্তি হলো ভয়ানক রসের প্রতীক।

তব কর-কমলবরে নখমদ্ভুত-শৃঙ্গম্ । ❀ ।
দলিত-হিরণ্যকশিপু-তনুভৃঙ্গম্ ॥ ❀ । ❀ । ❀ ।
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥৮॥

তোমার করকমলের নখ-শৃঙ্গে
যেদিন হিরণ্যকশিপুর দেহভৃঙ্গকে
করেছিলে বিদীর্ণ,
সেদিন হে কেশব, হে জগদীশ, হে শ্রীহরি,
তোমার ছিল নরহরি-রূপ,
তোমারই হউক জয় ॥ ৮ ॥

এই শ্লোকে জয়দেব ভগবানের নৃসিংহ-অবতারের কথা উল্লেখ করছেন। ভক্ত বালক প্রহ্লাদের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যে তিনি অর্দ্ধেক মানুষ আর অর্দ্ধেক সিংহের মূর্ত্তিতে ভয়ঙ্কর দানব হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। কারণ, হিরণ্যকশিপুর বর ছিল যে কোন মানুষের হাতে সে মরবে না। তাই ভগবানকে সেই অর্দ্ধ-মানব অর্দ্ধ-পশুর রূপ গ্রহণ করতে হয়। এইরূপে ভক্তের মান রক্ষা করেছিলেন বলে, পূজারী গোস্বামীর মতে এই মূর্ত্তি হলো বৎসল রসের প্রতীক।

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন ।✿।
পদনখ-নীর-জনিত-জন-পাবন ॥✿।✿
কেশব ধৃত-বামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥৭॥

বামনরূপ ধরে
যখন তুমি দৈত্যরাজ বলিকে করেছিলে ছলনা,
সেই সময় তোমার চরণ-নখে-আহত
আকাশ-গঙ্গার পবিত্র জলে
সমস্ত ধরণী হয়েছিল সুপবিত্র,
হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি,
তোমারি হউক জয় ॥ ৭ ॥

এই শ্লোকে জয়দেব বামন-অবতারের কথা উল্লেখ করছেন। বলিরাজ দৈত্যের ছিল প্রবল দম্ভ, তার চেয়ে বড় দাতা আর ত্রিভুবনে নেই। সাত্ত্বিকতার দম্ভও দম্ভ। তাই সেই দম্ভ দূর করবার জন্য ভগবান ক্ষুদ্র বামনের মূর্ত্তিতে বলির কাছে এসে মাত্র ত্রি-পাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। বলি সেই সামান্য প্রার্থনা শুনে অবজ্ঞায় হেসে ওঠে এবং তৎক্ষণাৎ তা দেবার জন্যে প্রতিশ্রুতি দেয়। তখন ভগবান বামন মূর্ত্তি পরিত্যাগ করে, দুই বিশাল বিরাট পদক্ষেপে স্বর্গ আর মর্ত্তকে পরিব্যাপ্ত করে ফেল্লেন। তৃতীয় পদ স্থানাভাবে বলির মাথার ওপর স্থাপন করেন। সেই বিশাল পদের চাপে বলি পাতালে নিমজ্জিত হয়ে যায়। বামনরূপ হলো সখ্য রসের প্রতীক।

ক্ষত্রিয়-রুধিরময়ে জগদপগতপাপম্ ।
স্নপয়সি পয়সি শমিত-ভবতাপম্ ॥
কেশব ধৃত-ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥১০

অত্যাচারী ক্ষত্রিয়ের রক্তে
পৃথিবীকে স্নান করিয়ে,
তুমি দূর করেছ তার পাপ-তাপ,
পরশুরাম-মূর্তিধারী
হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি,
তোমারি হউক জয় ॥ ১০ ॥

এই শ্লোকে জয়দেব পরশুরাম-অবতারের কাহিনী উল্লেখ করেছেন। মাতার অপমানে পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করবার প্রতিজ্ঞা করেন এবং সেই প্রতিজ্ঞার দরুণ তিনি একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন। ক্ষত্রিয়রা যখন নিজেদের বাহুবলের দম্ভে ক্ষিপ্ত হয়ে নিজেদের কর্তব্য ভুলে গিয়েছিল, সেই সময় পরশুরাম উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যেই বাহুবলেই ক্ষত্রিয়দের উচ্ছেদ করেন। কিন্তু এই হিংসার অভ্যাস ক্রমশঃ তাঁকেও পেয়ে বসে। সেইজন্য আদর্শ ক্ষত্রিয়রূপে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে অবশেষে তিনি পরাভূত হন। পরশুরাম হলেন রৌদ্র রসের প্রতীক।

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতি-কমনীয়ম্।
দশমুখ-মৌলিবলিং রমণীয়ম্ ॥ ॥ ॥
কেশব ধৃত-রামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥১১

দশদিকে আছে দশ দিকপতি,
তুমি সেই দশ দিকপতির আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে
দশানন রাবণের দশটা মাথা
যুদ্ধে দশদিকে করেছিল অর্পণ,
রামরূপধারী হে কেশব,
হে জগদীশ, হে হরি,
তোমারই হউক জয় ॥ ১১ ॥

জয়দেব রাম-অবতারের কথা উল্লেখ করছেন। রাম-অবতারে তিনি রাক্ষসরাজ দশাননকে বধ করে পৃথিবী থেকে দৈত্যপীড়ন দূর করেন। রামচন্দ্র করুণ রসের প্রতীক।



কেশবধৃত কূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে (কূর্ম্ম-অবতার)

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভম্ ।
হলহতি-ভীতি-মিলিত-যমুনাভম্ ॥ ❁ । ❁ ।
কেশব ধৃত-হলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥১২

তোমার শুভ্রদেহের
মেঘ-নীল বসনের ছায়ায়
ভয়-নীলা হয়ে ওঠে যমুনা,
ভীতা সে তোমার হলকর্ষণে…
হে হলধররূপধারী কেশব,
হে জগদীশ, হে হরি,
তোমারি হউক জয় ॥ ১২ ॥

জয়দেব হলধারী বলরাম মূর্ত্তির কথা উল্লেখ করছেন। শ্রীরামচন্দ্র নবদূর্ব্বাদলশ্যাম, শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ, বলরাম হলেন শুভ্রতনু। তাঁর আয়ুধ হলো, হল। কৃষকের দেবতা তিনি। বলরাম খুব হাস্যরসিক ছিলেন তাই পূজারী গোস্বামীর মতে বলরাম মূর্ত্তি হলো হাস্যরসের প্রতীক।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্ । ❀ ।
সদয়হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্ ॥ ❀ । ❀ ।
কেশব ধৃত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥১৩

দেবতার যজ্ঞে অবাধ পশুবধ দেখে
করুণায় উদ্বেল হয়ে ওঠে তোমার চিত্ত,
তাই সেই যজ্ঞবিধিকে নিন্দা করে
বুদ্ধ-মূর্ত্তিতে তুমিই হলে প্রকট ।
হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি,
তোমারি হউক জয় ॥ ১৩ ॥

একসময় ভারতবর্ষে ঠিক হিন্দু-মুসলমানের মতন, হিন্দু আর বৌদ্ধদের ছিল তুমুল ঝগড়া। বুদ্ধদেব বৈদিক যজ্ঞের বিরুদ্ধে অহিংসা ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাই ব্রাহ্মণেরা তাঁর ওপর কুপিত হন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ্য যুগে জয়দেব বুদ্ধদেবকে ভগবানের অবতাররূপে বন্দনা করেছেন। বুদ্ধদেব হলেন শান্তরসের প্রতীক।

ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালম্ ।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্ ॥ ॥ ॥
কেশব ধৃত-কল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১৪

ম্লেচ্ছতে ভরে গিয়েছে ধরণী,
সেই ম্লেচ্ছদের নিধনের জন্যে
আজ তুমি ধূমকেতুর মতন
এসেছ করাল তরবারি নিষ্কাষিত করে,
কল্কিরূপধারী হে কেশব,
হে জগদীশ, হে হরি,
তোমারি হউক জয় ॥ ১৪ ॥

দশ-অবতার বর্ণনার শেষ শ্লোকে জয়দেব অনাগত কল্কি-অবতারের উল্লেখ করছেন। পুরাণে ভবিষ্যৎবাণী করা আছে, কলিযুগে যখন পৃথিবী অনাচারী ম্লেচ্ছদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, তখন পৃথিবীকে পুনরায় পাপ-মুক্ত করবার জন্যে ভগবান নিষ্কাষিত তরবারি হাতে কল্কিরূপে দেখা দেবেন। কল্কিমূর্ত্তি হলো বীররসের প্রতীক।

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারম্ ।

শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্ ॥

কেশব ধৃত-দশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ১৫

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি,
এই দশরূপে তোমাকে বন্দনা করি।
তোমার বন্দনায় এনে দেয় সুখ,
এনে দেয় শুভ,
এনে দেয় অসার সংসারে যা সার-বস্তু·
তাই বন্দনা করি তোমায় ॥ ১৫ ॥

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে ।
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে ॥
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে ।
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে
কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥১৬

বেদকে তুমি করেছ উদ্ধার,
বহন করেছ পৃথিবীর ভার,
অঙ্গুলীতে ধারণ করেছ মেদিনী,
দৈত্যের অত্যাচার থেকে করেছ তাকে মুক্ত,
চূর্ণ করেছ ছলে বলির দর্প,
মুক্ত করেছ ধরণীকে ক্ষত্রিয়ের অনাচার থেকে,
জয় করেছ দুর্জয় দশাননকে,
শ্যামল করেছ মেদিনীকে হল কর্ষণ করে,
মুক্ত অন্তরে বিলিয়েছ করুণা,
তুমিই আবার আসবে ম্লেচ্ছনিধনকল্পে,
দশমূর্ত্তিধারী হে কৃষ্ণ তোমাকে প্রণাম ॥ ১৬ ॥

পূর্ব্ববর্ত্তী এক একটি শ্লোকে এক এক অবতারের বর্ণনা করে উপসংহারে এক সঙ্গে জয়দেব সেই দশাবতারধারী কৃষ্ণকে প্রণাম করছেন। এক এক বিভিন্ন রসের প্রতীক, তাই শ্রীকৃষ্ণ হলেন দশাবতারে সমগ্র রসের পরিপূর্ণ আধার !

গীতম্

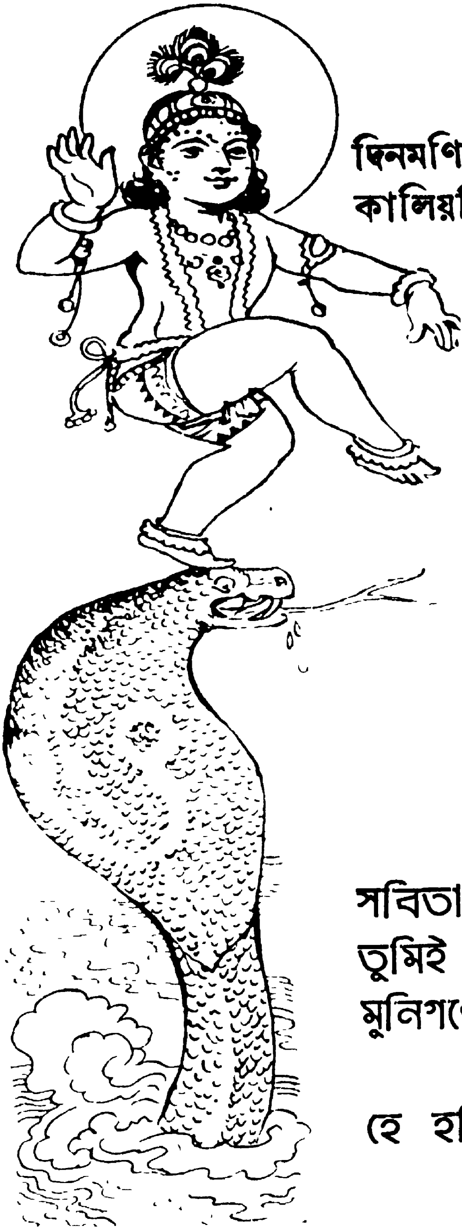
গুর্জ্জরীরাগেণ নিঃসারতালেন চ গীয়তে

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল কলিতললিতবনমাল
জয় জয় দেব হরে ॥ ১৭ ॥

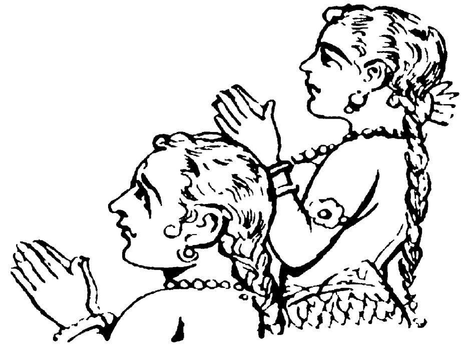


গান

কমলার কুচমণ্ডলে যাঁর আশ্রয়,
কুণ্ডলধারী,
সুমধুর বনফুলের মালায় শোভিত কণ্ঠদেশ,
হে হরি, তোমারি হোক্ জয় ॥ ১৭ ॥



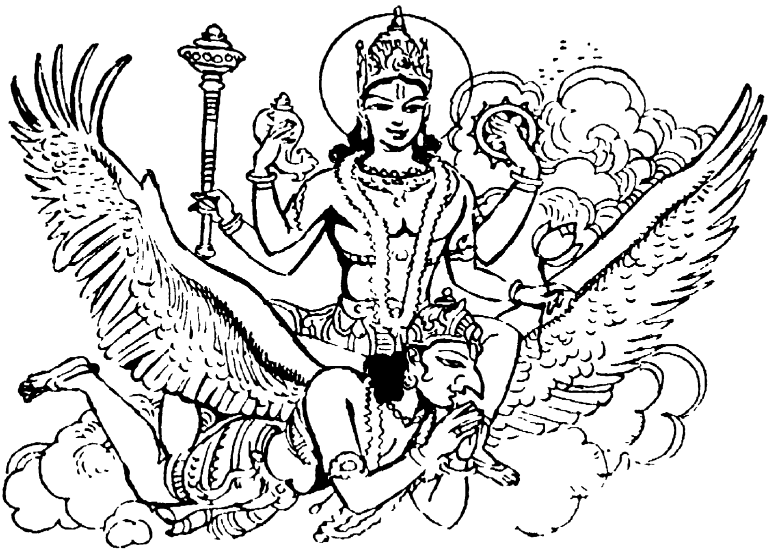
দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন মুনিজনমানসহংস ॥১৮॥
কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন যদুকুলনলিনদিনেশ ॥১৯॥



সবিতা মণ্ডলের তুমিই হলে শোভা,
তুমিই হলে ভববন্ধনের মুক্তির উপায়,
মুনিগণের অন্তর সরোবরে তুমিই করছো বিরাজ
পরমহংসের মত,
হে হরি তোমারই হোক্ জয় ॥ ১৮ ॥

বিষধর কালিয়নাগকে তুমিই করেছ দমন,
পৃথিবীর হৃদয়রঞ্জন
তুমিই হলে যদুকুলের সূর্য্যস্বরূপ,
হে দেব, হে হরি, তোমারি হোক্ জয় ॥ ১৯ ॥

মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন সুরকুলকেলিনিদান ॥ ২০ ॥
অমলকমলদললোচন ভবমোচন ত্রিভুবনভবননিধান ॥ ২১ ॥



মধু আর মুর আর নরকাসুর,
তাদের করেছ তুমি বিনাশ,
গরুড়াসন তুমিই হলে দেবতাদের আশ্রয়,
হে দেব, হে হরি, তোমারি হোক্ জয় ॥ ২০

অমল কমলের মত তোমার দুটি নয়ন,
তুমিই মোচন কর ভব-বেদন,
ত্রিভুবনের তুমিই হলে আশ্রয়ভবন,
হে দেব, হে হরি, তোমারি হোক্ জয় ॥ ২১



কেশবধৃত শূকররূপ জয় জগদীশ হরে (বরাহ অবতার)

জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ সমরশমিতদশকণ্ঠ ॥২২॥
অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর শ্রীমুখচন্দ্রচকোর ॥২৩॥



জনকের দুহিতা তোমার শ্রীঅঙ্গে
নিজে পরিয়ে দিয়েছেন ভূষণ,
সেই তুমি অত্যাচারী রাক্ষস দূষণকে
করেছ নিধন,
দশাননকে করেছ সংহার সংগ্রামে
হে দেব, হে হরি, তোমারি হোক্ জয় ॥২২॥

নতুন মেঘের মতন সুন্দর শ্যামল
কোমল তোমার দেহ,
অথচ সেই দেহে বহন করেছ মন্দর
পর্ব্বতের ভার,
তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন স্বয়ং লক্ষ্মী
হে দেব, হে হরি, তোমারি হোক্ জয় ॥ ২৩ ॥

তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু ॥ ২৪ ॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতিঃ ॥ ২৫ ॥



হে দেব, তোমার চরণ নিয়েছি শরণ,
শরণাগতের কুশল জানি তুমি
করবে বিধান ॥ ২৪ ।

তোমারি প্রসাদে কবি জয়দেবের এই গান
উজ্জ্বল রসপ্রধান
যেন করে জগতের আনন্দ বিধান ॥ ২৫ ॥

পদ্মাপয়োধরতটীপরিরম্ভলগ্ন-
কাশ্মীরমুদ্রিতমুরো মধুসূদনস্য ।
ব্যক্তানুরাগমিব খেলদনঙ্গখেদ-
স্বেদাম্বুপূরমনুপূরয়তু প্রিয়ং বঃ ॥ ২৬ ॥

পদ্মাকে আলিঙ্গনে বাঁধতে গিয়ে,
যাঁর বক্ষে এসে লেগেছে
পদ্মার স্তনতটের কুঙ্কুম,
সেই কুঙ্কুম আবার গলে ঝরে পড়ছে
ঘর্ম্মের সঙ্গে,
মদনসন্তাপের ঘর্ম্মের সঙ্গে,
সেই রক্তরাঙা গলিত কুঙ্কুমের ধারা
যাঁর অন্তরের সংগোপন অনুরাগেরই ধারা,
সেই মধুসূদন তোমাদের সকলের
করুন আনন্দবর্দ্ধন ॥২৬॥

বসন্তে বাসন্তীকুসুমসুকুমারৈরবয়বৈ-
র্ভ্রমন্তীং কান্তারে বহুবিহিতকৃষ্ণানুসরণাম্ ।
অমন্দং কন্দর্প-জ্বরজনিতচিন্তাকুলতয়া
বলদ্বাধাং রাধাং সরসমিদমূচে সহচরী ॥ ২৭ ॥



একদা এক বসন্ত দিনে,
কুসুমসুকুমারতনু শ্রীমতী রাধা,
মদনের বেদনায় কাতরা হয়ে
বৃন্দাবনের নিভৃত কুঞ্জপথে পথে
ইতিউতি যখন খুঁজে বেড়াচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণকে,
তখন এক প্রিয় সহচরী
প্রেমজ্বরে জর্জ্জরিত শ্রীমতীকে ডেকে বলে
মধুর বচনে,—॥২৭॥

গীতম্

বসন্তরাগযতিতালাভ্যং গীয়তে

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে ॥
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে।
নৃত্যতি যুবজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে ॥ ২৮ ॥



সখি গো,
কোমল মলয় সমীরে দুলে দুলে উঠছে
ললিত লবঙ্গ-লতা,
কুঞ্জকুটীরে কুটীরে উঠছে ঐ শোন
অলির গুঞ্জন আর কোকিলের কূজন,
বিরহী মনের ব্যথা দ্বিগুণ করে
বইছে সরস বসন্তপবন,
হায় সখি,
এমন মধুর বসন্ত দিনে
তোমার শ্রীহরি নৃত্যবিহার করছে
অপর তরুণীদের সঙ্গে ॥ ২৮ ॥

উন্মদমদনমনোরথপথিকবধূজনজনিতবিলাপে।
অলিকুলসঙ্কুলকুসুমসমূহনিরাকুলবকুলকলাপে ॥ ২৯ ॥



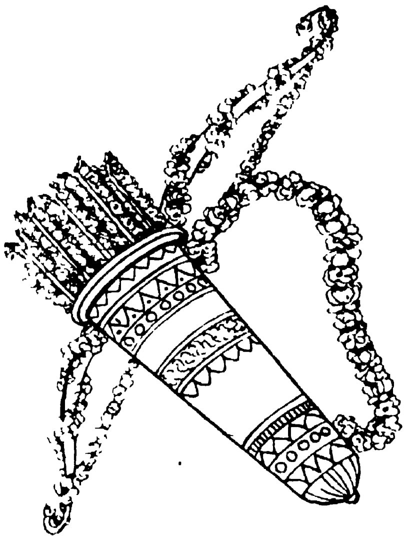
ওগো সখি,
এমন বসন্তদিনে,
ঐ শোন দিকে দিকে উঠছে বিরহের
রোদন-ধ্বনি,
প্রিয় যাদের গিয়েছে দূরদেশে প্রবাসে,
কাঁদছে সেই বিরহাকুল পথিকবধূরা,
সেই সঙ্গে সুর মিলিয়ে গুঞ্জন করছে অলিকুল
প্রস্ফুটিত বকুলের বনে বনে ॥ ২৯ ॥

মৃগমদসৌরভরভসবশংবদনবদলমালতমালে।
যুবজনহৃদয়বিদারণমনসিজনখরুচিকিংশুকজালে ॥ ৩০ ॥



ওগো সখি,
এমন বসন্তদিনে,
তমালের ডালে ডালে ফুটে উঠেছে
তমালের কুঁড়ি,
তার সুবাস আচ্ছন্ন করে ফেলেছে
মৃগমদের সৌরভকে,
বনে বনে ফুটে উঠেছে রক্তরাঙা পলাশের ফুল,
সে ফুল যেন
বিরহকাতর যুবজনের বুকে
হৃদয়-বিদারণ মদনের অকরুণ নখক্ষত ॥ ৩০ ॥

মদনমহীপতিকনকদণ্ডরুচিকেশরকুসুমবিকাশে।
মিলিতশিলীমুখপাটলিপটলকৃতস্মরতূণবিলাসে ॥ ৩১ ॥



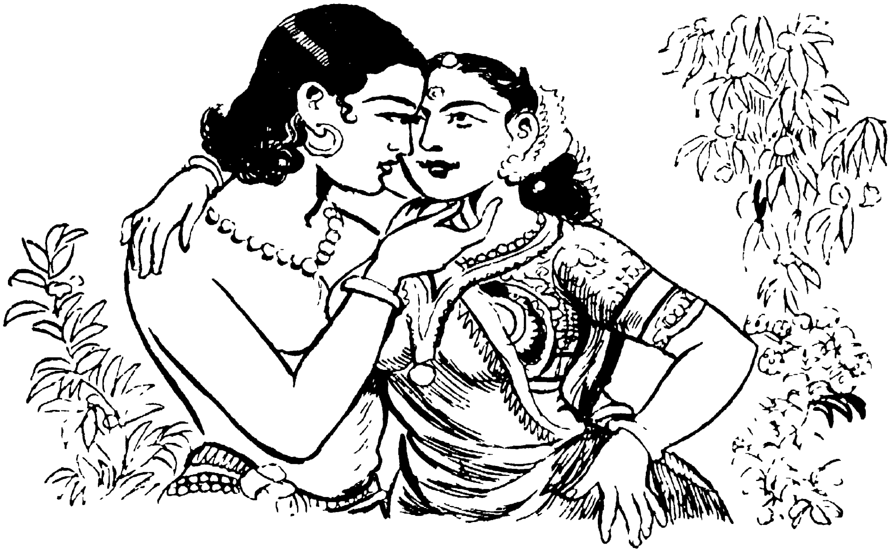
ওগো সখি,
এমন বসন্তদিনে ঐ দেখ বনে বনে
পরিপূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছে কেশর কুসুম,
যেন মদন রাজার স্বর্ণছত্রদণ্ড,—
ঐ দেখ থরে থরে ফুটে-ওঠা পাটলিফুলে
এসে বসেছে কালো ভ্রমরের দল,
যেন কামদেবের বাণ-ভরা পুষ্প-ধনু ॥ ৩১ ॥

বিগলিতলজ্জিতজগদবলোকনতরুণকরুণকৃতহাসে।
বিরহিনিকৃন্তনকুন্তমুখাকৃতিকেতকিদন্তুরিতাশে ॥ ৩২ ॥

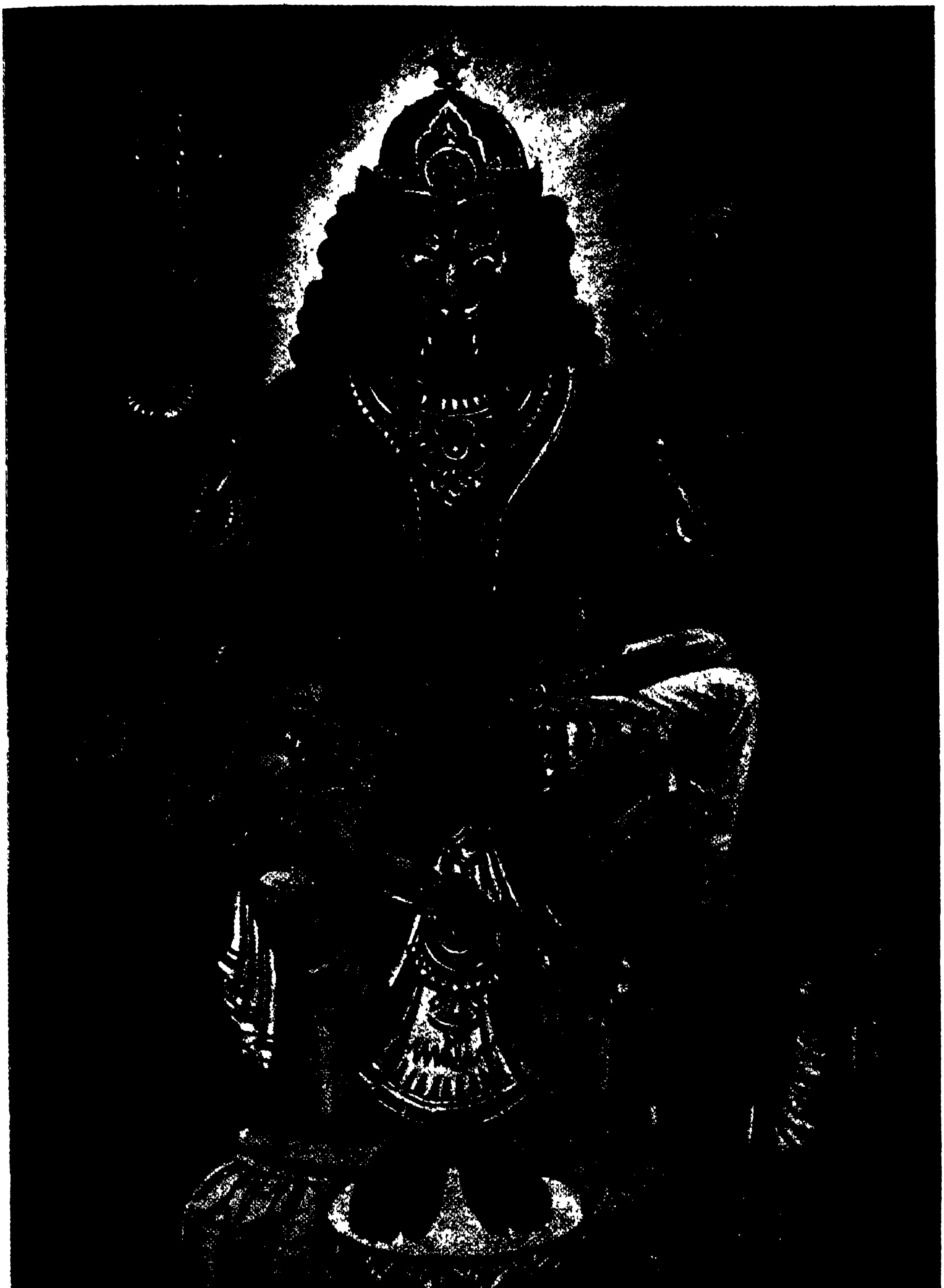
ওগো সখি,
এমন বসন্তদিনে,
মানুষ লজ্জাকে ভুলে গিয়েছে দেখে
হেসে উঠছে বাতাবী তরু।
ফুটন্ত ফুলের হাসিতে,
বিরহীদের মনকে বিদীর্ণ করবার
জন্য বর্শাফলকের মত
ফুটে উঠেছে কেতকী কুসুম।
মনে হচ্ছে যেন চারিদিক দন্তবিকাশ করে
হেসে উঠছে এই বাসন্তী নির্লজ্জতায় ॥৩২॥



মাধবিকাপরিমললিতে নবমালিকয়াতিসুগন্ধৌ।
মুনিমনসামপি মোহনকারিণি তরুণাকারণবন্ধৌ ॥ ৩৩ ॥



ওগো সখি,
আজিকার এই বসন্তদিন
মাধবীর পরিমলে হয়েছে ললিত,
মালতীর অতিগন্ধে হয়েছে সুরভিত,
এমন বসন্তদিনে মুনিদেরও মনে জাগে বিভ্রম,
তরুণেরা শুধু নেচে ওঠে অহেতুক আনন্দে...
সখি, বসন্ত হলো তরুণমনের মিতা ॥ ৩৩ ॥



কেশবধৃত নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে (নৃসিংহ-অবতার)

স্ফুরদতিমুক্তলতাপরিরম্ভণপুলকিতমুকুলিতচূতে।
বৃন্দাবনবিপিনে পরিসরপরিগতযমুনাজলপূতে ॥ ৩৪ ॥

ওগো সখি,
আজি এ বসন্তদিনে
পুলকে মুকুলিত হয়ে উঠেছে সহকার তরু
মাধবী-লতার আলিঙ্গনে,
যমুনার জলপূত বৃন্দাবনের বনে বনে
ওগো সখি, জেগে উঠেছে আজ ঋতুরাজ ॥ ৩৪ ॥



শ্রীজয়দেবভণিতমিদমুদয়তি হরিচরণস্মৃতিসারম্।
সরসবসন্তসময়বনবর্ণনমনুগতমদনবিকারম্ ॥ ৩৫ ।

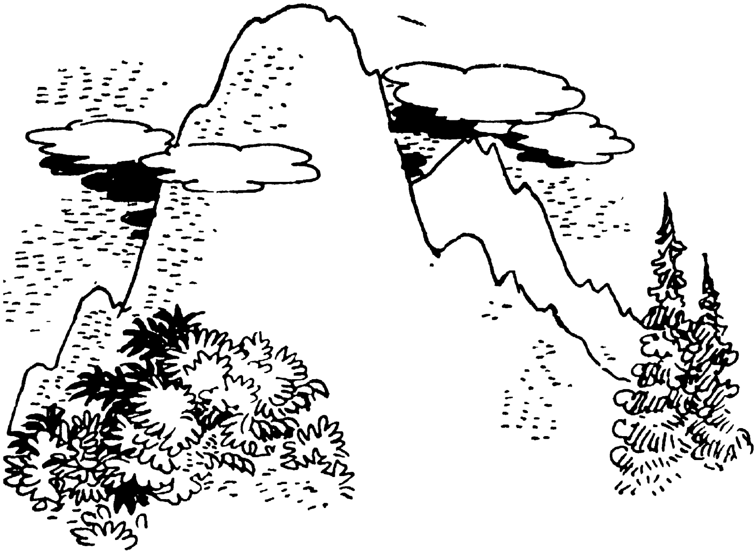
সরস-নব-বসন্তে, এই যে মদন-বিকার
বর্ণনা করে জয়দেব কবি,
স্মৃতি তার থাক্ জেগে
শ্যামের চরণ স্মরণের সনে
মানুষের মনে মনে ॥ ৩৫ ॥

দরবিদলিতমল্লীবল্লিচঞ্চৎপরাগ-
প্রকটিতপটবাসৈর্বাসয়ন্ কাননানি।
ইহ হি দহতি চেতঃ কেতকীগন্ধবন্ধুঃ
প্রসরদসমবাণপ্রাণবদ্‌গন্ধবাহঃ ॥ ৩৬ ॥



আজ বনে বনে এসেছে
মদনের প্রাণ-সখা বসন্ত-বাতাস
কেতকীর গন্ধে বিভোর,
মল্লীলতার বুক থেকে আহরণ করে পুষ্পপরাগ,
রেণু রেণু ক'রে দিকে বিদিকে
দেয় ছড়িয়ে তার সুগন্ধ,
সে-গন্ধের আগুনে দগ্ধ হয়ে যায় বিরহীর মন ॥ ৩৬ ॥

অন্যোৎসঙ্গবসভুজঙ্গকবলক্লেশাদিবেশাচলং
প্রালেয়প্লবনেচ্ছয়ানুসরতি শ্রীখণ্ডশৈলানিলঃ।
কিঞ্চ স্নিগ্ধরসালমৌলিমুকুলান্যালোক্য হর্ষোদয়া-
দুন্মীলন্তি কুহুঃ কুহুরিতি কলোত্তালাঃ পিকানাংগিরঃ ॥ ৩৭ ॥



বসন্ত এসে দেখে
চন্দনতরুকোটরে জেগে উঠেছে বিষধর সাপ,
বিষনিঃশ্বাসে জর্জ্জরিত হয়ে ওঠে তার স্নিগ্ধ তনু,
তাই শীত-স্নানের জন্যে দ্রুত এগিয়ে চলে
উত্তরে হিমালয়ের দিকে।
সহকারতরুশিরে জেগে ওঠে মুকুলের শিখা,
তাই দেখে আনন্দে উন্মাদ কুহুরবে জেগে ওঠে
পিককুল ॥ ৩৭ ॥

বসন্তের এই বর্ণনার দ্বারা কবি সাধারণ নৈসর্গিক ক্রিয়াকে অপরূপ কাব্যরূপ দিয়েছেন। বসন্ত বাতাস দক্ষিণ দিক থেকে এসে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে যায়, সেই ব্যাপারকে কবি ব্যাখ্যা করছেন, বসন্ত যেন সর্প-বিষে জর্জ্জরিত হয়ে দেহকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে হিমালয়ের দিকে যাত্রা করছে।

উন্মীলন্মধুগন্ধলুব্ধমধুপব্যাধুতচূতাঙ্কুর-
ক্রীড়ৎকোকিলকাকলীকলকলৈরুদ্গীর্ণকর্ণজ্বরাঃ।
নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথং কথমপি ধ্যানাবধানক্ষণ-
প্রাপ্তপ্রাণসমাসমাগমরসোল্লাসৈরমী বাসরাঃ ॥ ৩৮ ॥



মধুগন্ধে মাতাল ভ্রমরার দল
বারে বারে ব্যাকুল করে তুলছে নবীন আম্র-
মুকুলের মঞ্জরীকে,
কোকিলের কলকাকলি কানে বর্ষণ
করছে বিষ,
তার মধ্যে কেমন করে স্থির থাকে বিরহী
পথিকজনের মন ?
একমাত্র সান্ত্বনা,
একদিন আবার মিলিত হবে প্রিয়ার সঙ্গে,
সেই ধ্যানের ক্ষণিক উল্লাসে সে সহ্য করে এই
বসন্ত জ্বালা ॥ ৩৮ ॥

অনেকনারীপরিরম্ভসংভ্রমস্ফুরন্মনোহারিবিলাসলালসম্ ।
মুরারিমারাদুপদর্শয়ন্ত্যসৌ সখীসমক্ষং পুনরাহ রাধিকাম্ ॥ ৩৯ ॥



এ হেন বসন্ত দিনে,
ব্যাকুলা শ্রীমতীকে সঙ্গে নিয়ে
সখী দেখে, অদূরে কুঞ্জভবনে
ব্রজ বধূগণের আলিঙ্গনে
মুরারি মনোহারি প্রেমলীলায় রত,—
শ্রীমতীকে সেই দৃশ্য দেখিয়ে
সখী বলে ॥ ৩৯ ॥

গীতম্ ।

রামকিরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে

চন্দনচর্চ্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী ।
কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী ॥
হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে ॥ ৪০ ॥



পীত বসনে ঢাকা আজ বনমালীর নীল কলেবর,
নীল কলেবরে শোভা পাচ্ছে শ্বেতচন্দন,
লীলার মাতনে দুই কানে দুলছে মণিময় কুণ্ডল,
সেই মণির আভা এসে পড়েছে হাস্য-উজ্জ্বল
কপোলে,
প্রেমমুগ্ধ বিলাসিনীদের নিয়ে আজ প্রেমবিলাসে
রত বনমালী ॥ ৪০ ॥

পীনপয়োধরভারভারেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্ ।
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিতপঞ্চমরাগম্ ॥ ৪১ ॥



পীনপয়োধরভারে মন্থর এক গোপ বধূ
আবেগে আলিঙ্গনে বেঁধে বনমালীকে
কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে পঞ্চমে তুলেছে তান ॥ ৪১ ॥

কাপি বিলাসবিলোলবিলোচনখেলনজনিতমনোজম্ ।
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদনবদনসরোজম্ ॥ ৪২ ॥



কোন মুগ্ধ গোপবধূ
অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে
শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলের দিকে,
তাঁর নয়নের প্রেমঘন দিঠিতে
নব-অনুরাগে জেগে উঠছে গোপরমণীর
অন্তর শতদল ॥ ৪২ ॥

কাপি কপোলতলে মিলিতা লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে।
চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকূলে ॥ ৪৩ ॥



নিতম্বভারে কোন গোপরমণী
ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে শ্রীকৃষ্ণের কাছে,
কাণে কাণে কথা বলার ছলে
কপোলে রাখে কপোল,
কৌতুকে চেয়ে দেখে পুলকিত হয়ে উঠেছে মাধব,
অনুকূল লগ্ন বুঝে
চুম্বনে চিহ্নিত করে নীলগণ্ড ॥ ৪৩ ॥



কেলিকলাকুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনাজলকূলে।
মঞ্জুলবঞ্জুলকুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে ॥ ৪৪ ॥

কেলিকৌতুকে কোন কামিনী
মৃদু চরণে চলে এগিয়ে,
যমুনার তীরে বেণুকুঞ্জবনে
দেখে লুকিয়ে রয়েছে মাধব,
প্রেমলালসে তাঁর উত্তরীয়প্রান্ত করে আকর্ষণ ॥৪৪॥



কেশবধৃত বামনরূপ জয় জগদীশ হরে (বামন-অবতার)

করতলতালতরলবলয়াবলিতকলিতকলস্বনবংশে।
রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে ॥ ৪৫ ॥

শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাম্।
পশ্যতি সস্মিতচারু পরামপরামনুগচ্ছতি বামাম্ ॥ ৪৬ ॥



কোথাও বা মুরলীর সুরে
করতালি দিয়ে নাচে গোপাঙ্গনা
করতালির সাথে সাথে বেজে ওঠে হাতের বলয়,
রাসরসে হরি উন্মুখর প্রশংসায়
নাচতে সুরু করেন সুন্দরীর সঙ্গে ॥ ৪৫ ॥

রাস-রসে আজ হরি,
কোন নারীকে করেন আলিঙ্গন,
কাউকে বা চুম্বনে করেন তৃপ্ত,
কারুর সঙ্গে বা রত রমণে,
কাউকে বা দূর থেকে কটাক্ষদানে
করছেন মানভঞ্জনের চেষ্টা ॥ ৪৬ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমদ্ভুতকেশবকেলিরহস্যম্ ।
বৃন্দাবনবিপিনে ললিতং বিতনোতু শুভানিযশস্যম্ ॥ ৪৭

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্ ।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্তিমানিব মধৌ মুগ্ধোহরিঃ ক্রীড়তি ॥ ৪৮ ।

বৃন্দাবনের বিপিনে
কেশবের এই প্রেমলীলা
বর্ণনা করে কবি শ্রীজয়দেব ।
সেই সঙ্গে করে প্রার্থনা
যেন এই প্রেম-লীলা শ্রবণে
বর্দ্ধিত হয় আপনাদেরই কল্যাণ ॥ ৪৭ ॥

সখি !
প্রেমরঙে কেশব আজ
বিশ্বকে তুলেছে রঙীণ করে,
বিশ্বে আজ আনন্দ উঠছে উথলে ;
শ্যামের শ্যামল কোমলরূপে
আলোকিত হয়ে উঠেছে ধরা,
মুগ্ধা গোপবধূরা ঘন ঘন আলিঙ্গনে
স্বচ্ছন্দে আজ সমর্পণ করছে নিজেদের,
আনন্দিত মাধব আমার
বিরাজ করছেন যেন মূর্তিমান
শৃঙ্গার-রস ॥ ৪৮ ॥



রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভৃতামাভীরবামভ্রুবাম্
অভ্যর্ণে পরিরভ্য নির্ভরমুরঃ প্রেমান্ধয়া রাধয়া ।
সাধু ত্বদ্বদনং সুধাময়মিতি ব্যাহৃত্য গীতস্তুতি
র্ব্যাজাদুদ্ভটচুম্বিতঃ স্মিতমনোহারী হরিঃ পাতু বঃ ॥ ৪৯ ॥



রাসোল্লাসে বিহ্বলা গোপীদের সামনেই
প্রেমান্ধ শ্রীমতী বাহুপাশে বদ্ধ করেন মাধবকে ;
শ্রীমতীর মুখের দিকে চেয়ে
স্তুতি-ছলে বলেন মাধব,
সুধার ভাণ্ডার ঐ তব শ্রীমুখ,—
অধরে তুলে নেন সে সুধার ভার,—
তখন পরিতৃপ্ত মাধবের মুখে ফুটে ওঠে যে মধুর হাসি,
সেই হাসির আলোয় দূর হোক্ সব অকল্যাণের ভার ॥ ৪৯ ॥



চিত্র জয়দেব



দ্বিতীয় সর্গ

অক্লেশ কেশব

দ্বিতীয় সর্গ

অক্লেশ কেশব

এই সর্গে কবি জয়দেব রাধা-কৃষ্ণের বিচিত্র প্রেম-লীলার অন্তর্নিহিত কথাকে রূপ দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের গোপবালাদের নিয়ে প্রেম-লীলা করছেন, দূর থেকে বিরহবিধুরা শ্রীমতী সেই দৃশ্য দেখছেন। আজ তাঁর শ্রীহরি অন্য-নারীর সহবাসে মত্ত। শ্রীমতীর জেগে ওঠে শত স্মৃতি, মধুবনে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নিয়ে করেছেন প্রেম-লীলা। কিন্তু সমস্ত ঈর্ষ্যার ভেতর থেকে শ্রীমতীর মনে জেগে ওঠে প্রেমের পরম আশ্বাস-বাণী, শত-সহস্র নারীর সঙ্গে বিহার করলেও, শ্রীকৃষ্ণ তাঁরি। শ্রীকৃষ্ণও বৃন্দাবনের গোপরমণীদের মধ্যে দেখেন, সেই শ্রীমতীকেই। তাই এই প্রেমে নেই ঈর্ষ্যা, নেই ক্লেশ। শ্রীমতীর অন্তরে কৃষ্ণ করে চলেছেন অনন্ত রাস-লীলা। তবুও বাইরে যে অভিমান আর ঈর্ষ্যার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই, সে হলো রসের প্রয়োজনে। এই অভিমানের রসে রাধা-কৃষ্ণের নিত্য প্রণয়ই অধিকতর মধুর হয়ে ওঠে।



বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হরৌ-
বিগলিতনিজোৎকর্ষাদীর্ষ্যাবশেন গতান্যতঃ।
ক্বচিদপি লতাকুঞ্জেগুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডলী-
মুখরশিখরে লীনা দীনাপ্যুবাচ রহঃ সখীম্ ॥ ১ ॥

সখীর কথা শুনে
শ্রীমতীর মনে জেগে ওঠে ঈর্ষ্যা।
শ্রীমতী দেখেন,
যে-প্রণয়ে তিনি বাঁধা,
সেই প্রণয়ে হরি বেঁধেছেন অপর গোপনারীদের।
তাহলে কোথায় রইলো তাঁর শ্রেষ্ঠতা?
অভিমানে তাই শ্রীমতী সে-কুঞ্জ ছেড়ে
চলে গেলেন আর এক লতাকুঞ্জে,
সেখানে তরু শিরে শিরে
গুঞ্জন করে ফিরে মধুকরের দল।
নিভৃতে পাশে ডেকে নিয়ে এক সখীকে
দীনহীনার মতন কেঁদে বলেন শ্রীমতী ॥ ১ ॥



গীতম্

গুর্জ্জরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে

সঞ্চরদধরসুধামধুরধ্বনিমুখরিতমোহনবংশম্ ।
বলিতদৃগঞ্চলচঞ্চলমৌলিকপোলবিলোলবতংসম্ ॥
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্ ।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥ ২ ॥



ওগো সখি,
সুধার অধরে যার
বেজে ওঠে মোহন মুরলী,
গোপনারীর দিকে ঘন ঘন কটাক্ষপাতে
দুলে ওঠে যার মাথার মুকুট
কাণের মণিময় কুণ্ডল,
সেই শ্রীহরি আজ আমাকে করেছে ত্যাগ,
তবু আমার মন
পড়ে আছে সেই রাসমঞ্চে
যেখানে দুলেছি শুধু তিনি আর আমি ॥ ২

চন্দ্রকচারুময়ূরশিখণ্ডকমণ্ডলবলয়িতকেশম্
প্রচুরপুরন্দরধনুরনুরঞ্জিতমেদুরমুদিরসুবেশম্ ॥ ৩ ॥

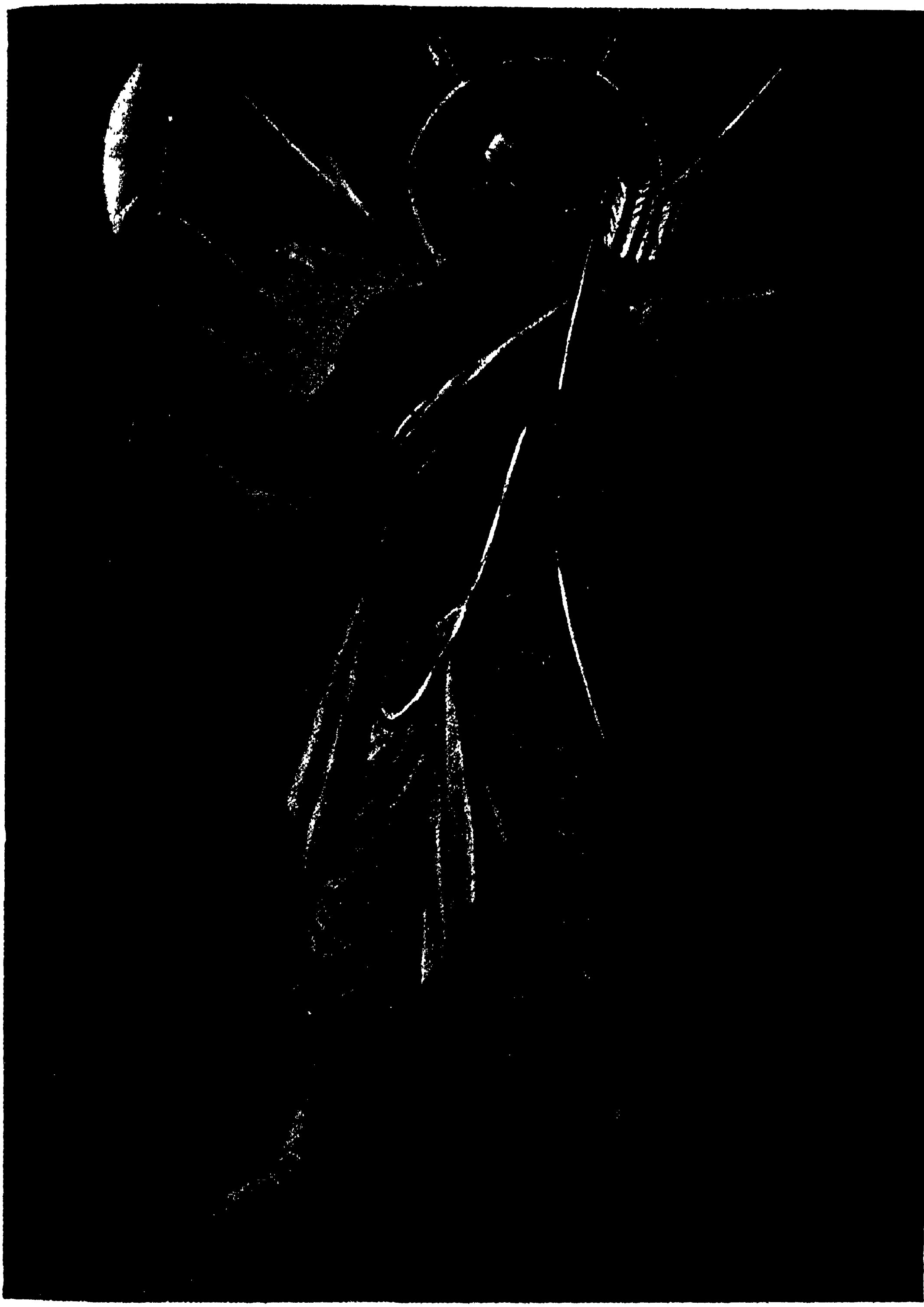
গোপকদম্বনিতম্ববতীমুখচুম্বনলম্ভিতলোভম্
বন্ধুজীবমধুরাধর-পল্লবমুল্লসিতস্মিতশোভম্ ॥ ৪ ॥



সখি গো,
শ্যামের কি রূপ!
মাথায় মণ্ডিত ময়ূরপুচ্ছের মুকুট
আধখানা চাঁদের মতন আঁকা,
মনে হয় শ্যাম যেন
ইন্দ্রধনু-আঁকা বর্ষার মেদুর মেঘ ॥ ৩



নিতম্ববতী গোপসুন্দরীদের মুখচুম্বনে
প্রলুব্ধ আজ শ্রীহরি,
বান্ধুলীফুলের মতন মধুর অধরে তাঁর
ফুটে আছে হাসির সুরভি-ভার ॥ ৪ ॥



কেশবধৃত ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে (পরশুরাম-অবতার)

বিপুলপুলকভুজপল্লববলয়িতবল্লবযুবতিসহস্রম্
করচরণোরসি মণিগণভূষণকিরণবিভিন্নতমিস্রম্ ॥ ৫ ॥



পুলকে বিপুল তাঁর ভুজপল্লবে
আজ বাঁধা পড়েছে সহস্র বল্লব যুবতী,
করেতে কঙ্কণ, চরণে নূপুর,—
মেখলায় মণিহার
আলিঙ্গনের ছন্দে উঠে দুলে,
ঠিকরে পড়ে আলো, রতন-ভূষণের আলো ;
সে-আলোয় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়—
কুঞ্জের আঁধার ॥ ৫ ॥

জলদপটলবলদিন্দুবিনিন্দকচন্দনতিলকললাটম্
পীনপয়োধরপরিসরমর্দ্দননির্দ্দয়হৃদয়কবাটম্ ॥ ৬ ॥

মণিময়করমনোহরকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডমুদারম্
পীতবসনমনুগতমুনিমনুজসুরবরপরিবারম্ ॥ ৭ ॥



ললাটে যাঁর চন্দন-তিলক
লজ্জা দেয় মেঘে-ঢাকা চন্দ্রকে,
হৃদয় তাঁর মমতা-বিহীন
পীনপয়োধর-পীড়নে ॥ ৬ ॥

মকর-মনোহর মণিময় কুণ্ডল
দোলে যাঁর সুন্দর কপোলে,
অপরূপ তাঁর পীতবসনের শোভায়
বাঁধা পড়েছে সুর, নর, মুনি-
কন্যাদেরও হৃদয় ॥ ৭ ॥

বিশদকদম্বতলে মিলিতং কলিকলুষভয়ংশময়ন্তম্
মামপি কিমপি তরঙ্গদনঙ্গদৃশা মনসা রময়ন্তম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমতিসুন্দর-মোহন-মধুরিপুরূপম্
হরিচরণস্মরণং প্রতি সংপ্রতিপুণ্যবতামনুরূপম্ ॥ ৯ ॥



দূর করে কলির পাপ ভয়
বিকশিত কদম্বের মূলে,
হৃদয়ে আর নয়নে নিয়ে উচ্ছল অনঙ্গের তরঙ্গ,
আমি জানি সখি,
শ্রীহরি বিহার করছেন আমারই সঙ্গে ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেব কবি এই যে দেখছে
মধুরিপুর মোহন মূর্ত্তি,
আর পুণ্যবানেরা দেখছে যে শ্রীচরণ,
দুই-ই হলো এক ॥ ৯ ॥

গীতম্

মালবরাগৈকতালী তালাভ্যাং গীয়তে

নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তম্
চকিতবিলোকিতসকলদিশা রতিরভসরসেন হসন্তম্ ।
সখি হে কেশিমথনমুদারম্
রময় ময়া সহ মদনমনোরথভাবিতয়া সবিকারম্ ॥ ১০ ॥



ওগো সখি,
আমার কামনা যার অন্তরে তোলে কামনার ঢেউ,
সেই কেশীমথন আমার প্রিয়,
তার সঙ্গে ত্বরায় আমাকে করো মিলিত,—
আমি যখন রজনীতে নিভৃতে আসি কুঞ্জবনে
প্রিয় আমার রঙ্গছলে থাকে লুকিয়ে,
চকিতনয়নে ইতিউতি যখন চাই চারিদিকে
মধুর হাসিতে প্রিয় দেয় তখন ধরা ॥ ১০ ॥

প্রথমসমাগমলজ্জিতয়া পটুচাটুশতৈরনুকূলম্ ।
মৃদুমধুরস্মিতভাষিতয়া শিথিলীকৃতজঘনদুকূলম্ ॥ ১১ ॥

কিশলয়শয়ননিবেশিতয়া চিরমুরসি মমৈব শয়ানম্
কৃতপরিরম্ভণ-চুম্বনয়া পরিরভ্য কৃতাধরপানম্ ॥ ১২ ॥

মনে পড়ে সখি,
প্রথম-মিলন-লজ্জায় যখন থাকি অধোমুখ,
কতশত চাটু বচনে কেমন করে
আমাকে দেয় ভুলিয়ে,
তারপর কখন কথা কইতে কইতে
মৃদু হেসে শিথিল করে দেয় আমার জঘন-বসন ॥ ১১ ॥



কিশলয়-শয়নে যখন থাকি শুয়ে,
প্রিয় আমার শয্যা রচনা করে আমারই বক্ষে,
দুই বাহুপাশে বেঁধে যখন করি চুম্বন
চুম্বনে প্রিয় আমার দেয় প্রত্যুত্তর ॥ ১২ ॥

অলসনিমীলিতলোচনয়া পুলকাবলিললিতকপোলম্
শ্রমজলসকলকলেবরয়া বরমদনমদাদতিলোলম্ ॥ ১৩ ॥

কোকিলকলরবকূজিতয়া জিতমনসিজ-তন্ত্রবিচারম্ ।
শ্লথকুসুমাকুলকুন্তলয়া নখলিখিতঘনস্তনভারম্ ॥ ১৪ ॥

প্রেমলালসে যখন আঁখি আমার আসে মুদে,
প্রেমপুলকিত হয়ে ওঠে প্রিয়ের গণ্ড,
আমার অঙ্গের শ্রম-জলধারা দেখে
জ্বলে ওঠে দ্বিগুণ মদনানল প্রিয়ের অন্তরে ॥ ১৩ ॥



রতিকালে যখন আমি কূজন করে উঠি
প্রেমশাস্ত্র-পণ্ডিত প্রিয় আমার ভুলে যায় তখন
কামকেলির পৌর্ব্বাপর্য্য,
আলুলায়িত কেশপাশ থেকে যখন শিথিল হয়ে
ঝরে পড়ে কুসুম,
অধীর প্রিয় আমার ঘন স্তনভারে মুদ্রিত করে
দেয় নখরেখা ॥ ১৪ ॥

চরণরণিতমণিনূপুরয়া পরিপূরিতসুরতবিতানম্।
মুখরবিশৃখলমেখলয়া সকচগ্রহচুম্বনদানম্ ॥ ১৫ ॥

রতিসুখসময়-রসালসয়া দরমুকুলিতনয়নসরোজম্
নিঃসহনিপতিততনুলতয়া মধুসূদনমুদিতমনোজম্ ॥ ১৬ ॥



আমার চরণের মণিময় নূপুর
যখন বেজে ওঠে রুণু ঝুনু,
সম্পূর্ণ হয় তখন প্রিয়তমের সুরতবিতান—
বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে যখন মুখর মেখলা
কেশ আকর্ষণ করে প্রিয় আমার করে চুম্বন ॥ ১৫ ॥

রতিসুখ-আবেশে
যখন শিথিল হয়ে আসে তনু,
তখন জেগে ওঠে প্রিয়তমের আঁখিমুকুল—
এলিয়ে যখন পড়ে দেহলতা
নতুন করে তখন জেগে ওঠে প্রেমের দেবতা
আমার মাধবের মনে ॥ ১৬ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমতিশয়মধুরিপুনিধুবনশীলম্ ।
সুখমুৎকণ্ঠিতগোপবধুকথিতং বিতনোতুধুসলীলম্ ॥ ১৭ ॥

হস্তস্রস্তবিলাসবংশমনৃজু-ভ্রূবল্লিমদ্বল্লবী-
বৃন্দোৎসারি-দৃগন্তবীক্ষিতমতিস্বেদার্দ্রগণ্ডস্থলম্ ।
মামুদ্বীক্ষ্য বিলক্ষিতস্মিতসুধামুগ্ধাননং কাননে
গোবিন্দং ব্রজসুন্দরীগণবৃতং পশ্যামি হৃষ্যামি চ ॥ ১৮ ॥

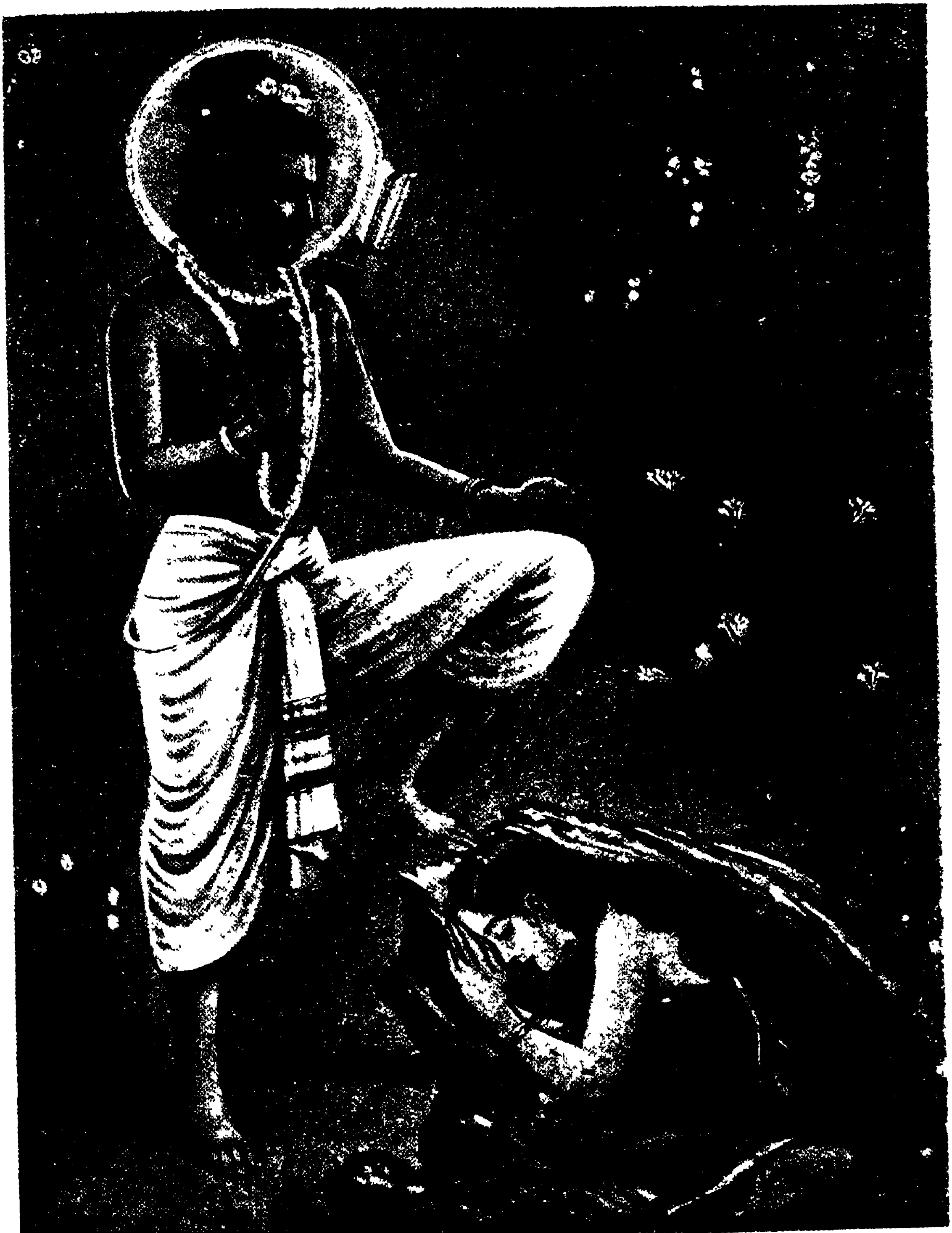


উৎকণ্ঠিতা গোপবধূর কণ্ঠে
মধু-রিপুর এই বিলাস-আবেশ-গীতি
যা বর্ণনা করলেন জয়দেব কবি,
ভক্তদের হৃদয়ে তা বিস্তার করুক
অনায়াস সুখের সুমধুর লীলা ॥ ১৭ ॥

আমি জানি সখি,
যতই কেন গোপবধূরা প্রেমকটাক্ষে
বিদ্ধ করুক মাধবকে,
মাধবের আঁখি আছে আমাতে বাঁধা।
আমার দর্শনে
আপনা হতে স্বেদসিক্ত হয়ে ওঠে তাঁর কপোল,—
হাত থেকে খসে পড়ে বিলাস-বংশী,
মুগ্ধ হাসিতে ভরে ওঠে মুখ,



শত-গোপিনী-বেষ্টিত সেই আমারই মাধব,
আমি আনন্দিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছি তারি দিকে ॥ ১৮ ॥



কেশবধৃত রাম-রূপ জয় জগদীশ হরে (রাম-অবতার)

স্ফুরালোকঃ স্তোকস্তবক-নবকাশোকলতিকা-
বিকাশঃ কাসারোপবনপবনোঽপি ব্যথয়তি।
অপি ভ্রাম্যদ্‌ভৃঙ্গীরণিতরমণীয়া ন মুকুল-
প্রসূতিশ্চূতানাং সখি শিখরিণীয়ং সুখয়তি ॥ ১৯ ॥

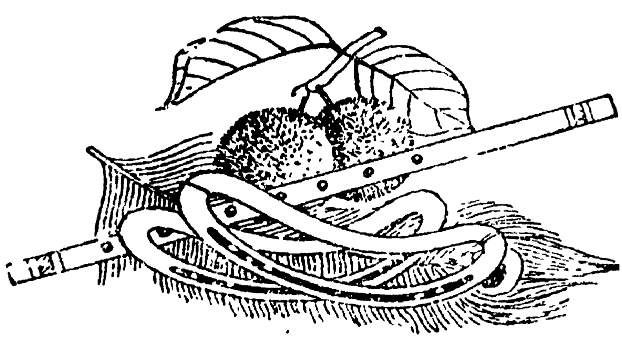


অশোকের লতা আজ
আধ-বিকশিত হয়ে ওঠে তরুণ পাতায়,
ভাল লাগে না সখি—
ভাল লাগে না এই কানন-জাগানো
মন্দমধুর পবন,
রসাল মুকুলে গুঞ্জন করে ফিরে
চিরচঞ্চল ভ্রমরের দল,
ভাল লাগে না আজ সে মধু-গুঞ্জন ॥ ১৯ ॥

সাকূতস্মিতমাকুলাকুলগলদ্ধম্মিল্লমুল্লাসিত-
ভ্রূবল্লীকমলীকদর্শিতভুজামূলার্দ্ধদৃষ্টস্তনম্ ।
গোপীনাং নিভৃতং নিরীক্ষ্য গমিতাকাঙ্ক্ষশ্চিরং চিন্তয়-
ন্নন্তর্মুগ্ধমনোহরং হরতু বঃ ক্লেশং নবঃ কেশবঃ ॥ ২০ ॥



যতই কেন গোপীরা
হাসিতে হোক্ উচ্ছল,
যতই কেন প্রেমকটাক্ষে
তারা হোক্ উল্লসিত,
শিথিল কেশপাশ বাঁধবার ছলে ঊর্দ্ধে তুলে বাহু
যতই কেন তারা দেখাক না অর্দ্ধ-প্রকাশিত স্তনমূল,
আমি জানি সখি,
মাধবের অন্তরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আছে
এই প্রেমবিধুরা রাধা,
সেই আমার মনোহর নব-কেশব
দূর করুক নিখিলের ক্লেশভার ॥ ২০ ॥





তৃতীয় সর্গ

মুগ্ধ মধুসূদন

তৃতীয় সর্গ

মুগ্ধ মধুসূদন

গোপনারীদের সঙ্গ ত্যাগ করে মাধব চলেছেন শ্রীমতীর সন্ধানে। তিনি জানেন, অভিমান-ভরে শ্রীমতী নিশ্চয়ই কঠিন ব্যথা পাচ্ছেন। কিন্তু কোথায় তাঁকে খুঁজে পাবেন? জগৎ-সংসার যাঁকে খুঁজে বেড়ায়, সেই শ্রীকৃষ্ণ-মাধব আজ উন্মাদ হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন শ্রীমতীকে। জয়দেব কবি এই সর্গে তাই বর্ণনা করছেন রাধার প্রেম-মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণের আকুলতা। কেমন করে, কাকে জানাবেন তিনি, শত-সহস্র গোপনারী-বেষ্টিত হয়ে থাকলেও তাঁর মন পড়ে আছে সেই শ্রীমতীর কাছে। তাই মুগ্ধ মধুসূদন বিস্মিত হয়ে নিজেই বলছেন, আমার অন্তর যে রয়েছে অভিন্ন, তাকে কেন বাইরে অনুসরণ করে পাচ্ছি ব্যথা?



কংসারিরপি সংসার-বাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্ ।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ১ ॥

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণ-ব্রণখিন্নমানসঃ ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনীতটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥ ২ ॥

যার জন্যে সংসার-বাসনার শৃঙ্খল
আনন্দে পরেছেন কংসারি,
সেই রাধাকে হৃদয়ে ধ্যান করতে করতে
মাধব সহসা ছেড়ে চললেন ব্রজসুন্দরীদের সঙ্গ ॥ ১ ॥



প্রেম-বাণে বিদ্ধ মাধব
ইতিউতি চারিদিকে খুঁজে বেড়ান
কোথায় গেলেন শ্রীমতী,
ব্যথিতচিত্তে কোথাও না পেয়ে দর্শন
যমুনার তীরে এক কুঞ্জবনে
বিষণ্ণ মনে বসে ভাবেন ॥ ২ ॥

গীতম্

গুর্জ্জরীরাগেণ যতিতালেন চ গীয়তে

মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধূনিচয়েন।
সাপরাধতয়া ময়াপি ন বারিতাতিভয়েন।
হরি হরি হতাদরতয়া গতা সা কুপিতেব ॥ ৩ ॥

কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি সা চিরং বিরহেণ
কিং ধনেন জনেন কিং মম জীবিতেন গৃহেণ ॥ ৪

আমাকে গোপবধূরা ঘিরে আছে
দেখে অভিমানে চলে গেলেন শ্রীমতী,
সেই অপরাধে তখন আমি ভয়ে
বলতে পারিনি কোন কথা।



হরি! হরি! অনাদৃতা মনে করে
তিনি চলে গিয়েছেন রাগ ভরে ॥ ৩ ॥

দীর্ঘকাল আমার বিরহে,
জানি না তিনি কি করছেন, কি বলছেন
তাঁর অভাবে আমারই বা কি কাজ
ধন জন গৃহে? ॥ ৪ ॥

চিন্তয়ামি তদাননং কুটিলভ্রু কোপভরেণ
শোণপদ্মমিরোপরি ভ্রমতাকুলং ভ্রমরেণ ॥ ৫ ॥

তামহং হৃদি সঙ্গতামনিশং ভৃশং রময়ামি।
কিং বনেঽনুসরামি তামিহ কিং বৃথা বিলপামি ॥ ৬ ॥



মনে পড়ে তার
আরক্ত মুখমণ্ডল,
কালো ভ্রূ-রাগে হয়ে আছে চঞ্চল-
যেন রক্তপদ্মের ওপর
ঘুরে বেড়াচ্ছে আকুল ভ্রমর ॥ ৫ ॥

হায়, অনুক্ষণ হৃদয়ে আমার
আমি তো অনুভব করছি তার প্রিয় সঙ্গ,
তবে কেন বাইরে বনে বনে
বৃথা অনুসরণে মরছি বিলাপ করে? ॥ ৬ ॥

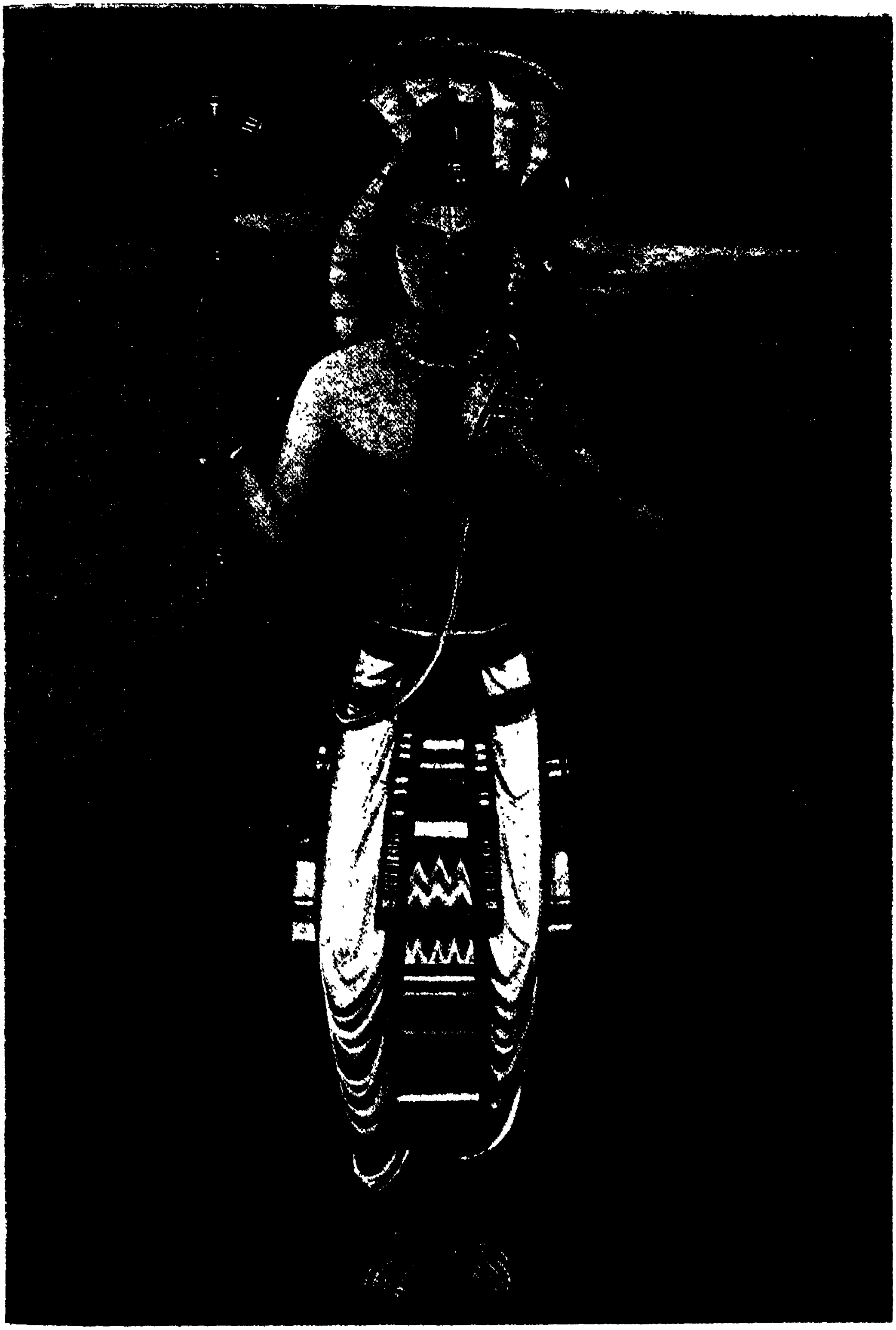
তন্বি খিন্নমসূয়য়া হৃদয়ং তবাকলয়ামি।
তন্ন বেদ্মি কুতো গতাসি ন তেন তেঽনুনয়ামি ॥ ৭ ॥

দৃশ্যতে পুরতো গতাগতমেব মে বিদধাসি।
কিং পুরেব সসম্ভ্রমং পরিরম্ভণং ন দদাসি ॥ ৮ ॥



হায় তন্বি,
আমি জানি কি নিদারুণ ঈর্ষ্যায়
ব্যথিত হয়েছে তোমার মন,
কিন্তু কোথায় তুমি,
কেমন করে তোমার কাছে চাইবো ক্ষমা? ॥ ৭

হায় সখি,
আমি দেখছি,
তুমি যেন আমার সামনে দিয়ে যাতায়াত করছো,
কিন্তু কেন তবুও তুমি আমাকে আলিঙ্গন দান
করছো না? ॥ ৮ ॥



কেশবধৃত হলধররূপ জয় জগদীশ হরে (বলরাম-অবতার)

ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং ন করোমি
দেহি সুন্দরি দর্শনং মম মন্মথেন দুনোমি ॥ ৯ ॥

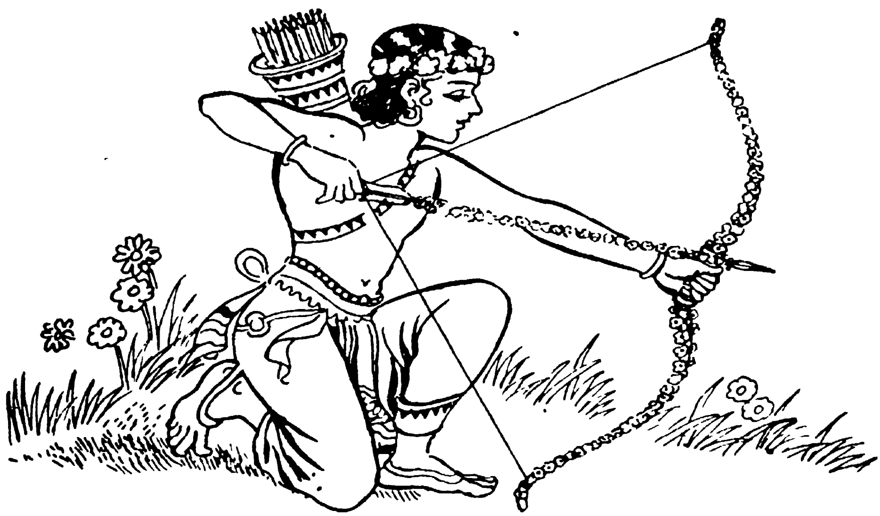
বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন
কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভবরোহিণীরমণেন ॥ ১০ ॥



ওগো সখি,
ক্ষমা কর আমার অপরাধ,
আর কখনো এ অপরাধ করবো না।
দেখ, তোমার বিরহে কাতর বিবশ আমি,
দর্শন দাও আমাকে ॥ ৯ ॥

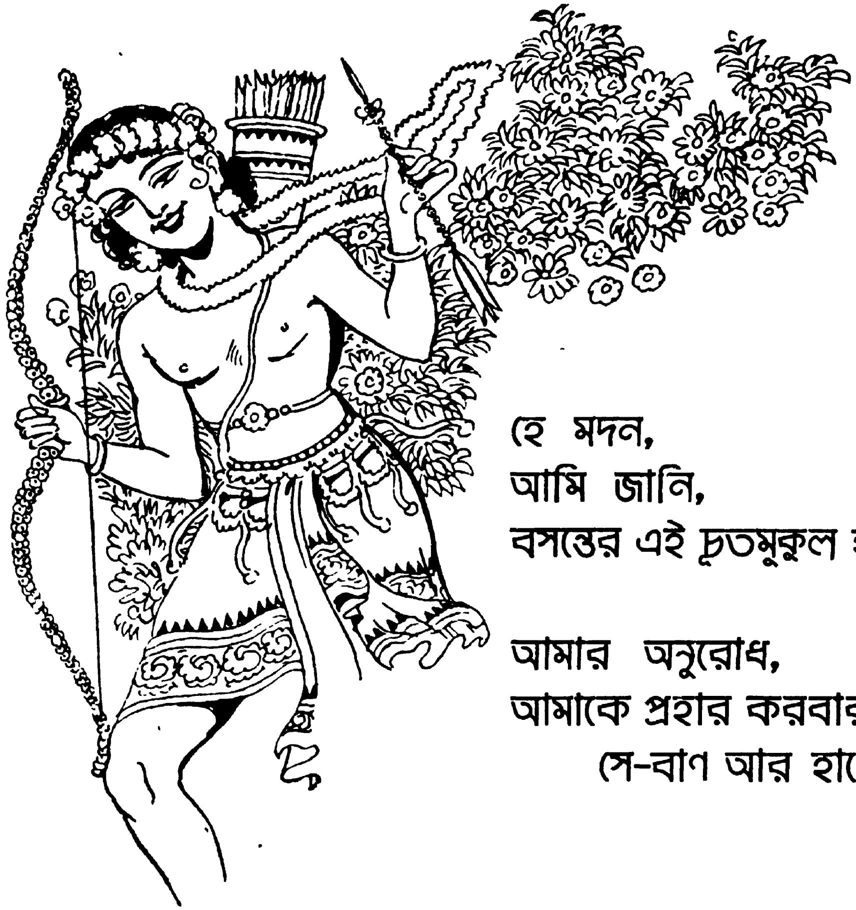
কেন্দুবিল্ব-সায়র থেকে
চাঁদের মতন উঠেছে যে জয়দেব-কবি,
নম্রনত সুরে আজ সে গান করে
মাধবের এই বিরহ-লীলা ॥ ১০ ॥

হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমুধাবসি ॥ ১১ ॥



হে কন্দর্প,
বক্ষে আমার দুলছে মৃণাল-হার, ভুজঙ্গ নয়,
কণ্ঠে দেখছো যে নীল দ্যুতি, সে বিষে নীল নয়,
সে হলো নীলকুবলয়-দলের মালা,
অঙ্গে আমার দেখছো যে ভস্ম,
সে ভস্ম নয়, চন্দন-চূর্ণ।
প্রিয়াবিচ্ছেদের যন্ত্রণায় আমি নিশ্চল হয়ে আছি,
তুমি মহাদেব মনে করে অকারণে আমাকে
আঘাত করছো,
অকারণে ক্রোধে আমার দিকে ধাবিত হচ্ছো ॥ ১১।

পাণৌ মা কুরু চূতসায়কমমুং মা চাপমারোপয়
ক্রীড়ানির্জ্জিতবিশ্বমূর্চ্ছিতজনাঘাতেন কিং পৌরুষম্ ।
তস্যা এব মৃগীদৃশো মনসিজপ্রেঙ্খৎকটাক্ষাশুগ-
শ্রেণীজর্জ্জরিতং মনাগপি মনো নাদ্যাপি সংধুক্ষতে ॥ ১২ ॥



হে মদন,
আমি জানি,
বসন্তের এই চূতমুকুল হলো
তোমার বাণ,
আমার অনুরোধ,
আমাকে প্রহার করবার জন্যে
সে-বাণ আর হাতে নিয়ো না ।

ক্রীড়াচ্ছলে অনায়াসে তুমি বিশ্বকে করেছ জয়,
আমার মতন মূর্চ্ছিত লোককে আঘাত করে
তোমার কি আর পৌরুষ বাড়বে ?
তুমি তো জান, সেই মৃগনয়নার দৃষ্টিবাণে
আগে থাকতেই আমার চিত্ত জর্জ্জরিত হয়ে আছে,
আজও সমানে করে রেখেছে আমাকে
ব্যথাচঞ্চল ॥ ১২ ॥

ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গিতানি
বাণা গুণঃ শ্রবণপালিরিতি স্মরেণ।
তস্যামনঙ্গজয়জঙ্গমদেবতায়া-
মস্ত্রাণি নির্জ্জিতজগন্তি কিমর্পিতানি ॥ ১৩ ॥



আজ মনে হয়
শ্রীমতী স্বয়ং যেন কাম-বিজয়িনী দেবী—
ভ্রূপল্লব হলো তাঁর ধনু,
কটাক্ষ হলো তাঁর বাণ,
শ্রবণপ্রান্ত যেন ধনুকের গুণ—

হে তন্বি,
তোমার ভ্রূ-ধনুকে যে কটাক্ষ-বাণ যোজনা করেছ
তাতে আমার যাতনার অন্ত নেই,
তোমার মুক্ত কবরী-ভার যেন খড়্গের মতন
আমাকে নিধন করতে উদ্যত হয়েছে,
তোমার রক্তিম বিম্বাধর দেখে
সারা দেহে জেগে উঠছে মোহ,—
শত্রু-নিপাতের পক্ষে সেই তো যথেষ্ট,
তবে কেন তোমার সুগোল কুচযুগল দিয়ে
আবার প্রাণ-সংহারের খেলা খেলছো ? ॥ ১৩ ॥

তানি স্পর্শসুখানি তে চ তরলাঃ স্নিগ্ধা দৃশোর্বিভ্রমা-
স্তদ্বক্ত্রাম্বুজসৌরভং স চ সুধাস্যন্দী গিরাংবক্রিমা।
সা বিম্বাধরমাধুরীতি বিষয়াসঙ্গেঽপি চেন্মানসং
তস্যাং লগ্নসমাধি হন্ত বিরহব্যাধিঃ কথং বর্দ্ধতে ॥ ১৪ ॥



শ্রীমতীর ধ্যানে আমি জানি
আমার অন্তর জুড়ে রয়েছেন তিনি,
সেখানে নিত্য আমি অনুভব করছি তাঁর স্পর্শসুখ,
দেখছি তাঁর চপল আঁখির স্নিগ্ধ কটাক্ষ,
নিয়ত পাচ্ছি সৌরভ তাঁর মুখকমলের,
শুনছি তাঁর সুধামাখা বাণী,
গ্রহণ করছি বিম্বাধরের অমৃত প্রসাদ,
তবু কেন অন্তর হচ্ছে না তৃপ্ত ?
বিরহ-বেদনা কেন প্রতিমুহূর্তে যাচ্ছে বেড়ে ? ॥ ১৪ ॥

তির্য্যক্‌কণ্ঠবিলোলমৌলিতরলোত্তংসস্য বংশোচ্চরদ্-
গীতিস্থানকৃতাবধানললনালক্ষৈর্ন সংলক্ষিতাঃ।
সম্মুগ্ধং মধুসূদনস্য মধুরে রাধামুখেন্দৌ মৃদুস্পন্দং
কন্দলিতাশ্চিরং দধতু বঃ ক্ষেমং কটাক্ষোর্ম্ময়ঃ ॥ ১৫ ॥



শ্রীকৃষ্ণের বাঁকা চাউনীতে
উল্লসিত হয়ে ওঠে রাধার কমল-আনন ঃ
সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ বেঁকে যায় তাঁর গ্রীবাদেশ,
তার ফলে দুলে ওঠে চূড়া আর কুণ্ডল।
গোপীরা কিন্তু তখনো একমনে শুনছিল
শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর সুর,
তাই তাদের চোখে ধরা পড়ে না শ্রীকৃষ্ণের সেই
অপাঙ্গদৃষ্টি,
কিন্তু কবি জয়দেবের সৌভাগ্য,
সে দেখেছে প্রেমময়ের সেই প্রেমকটাক্ষ,
তাই সে প্রার্থনা করে,
সে মধুর কটাক্ষে জেগে উঠুক নিখিলের কল্যাণ ॥ ১৫ ॥

চিত্রে জয়দেব
গীতগোবিন্দ



চতুর্থ সর্গ
স্নিগ্ধ মধুসূদন

চতুর্থ সর্গ

স্নিগ্ধ মধুসূদন

এই সর্গে কবি জয়দেব শ্রীকৃষ্ণের দুশ্চিন্তা দূর করে তাঁকে স্নিগ্ধ করেছেন। তাই এই সর্গের নাম স্নিগ্ধ মধুসূদন। অন্য নারীর সঙ্গে প্রেমলীলায় লজ্জিত শ্রীকৃষ্ণ আকুলভাবে শ্রীমতীকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন এবং শ্রীমতীর বিরহে আকুল হয়ে উঠছিলেন। মনে মনে তাঁর শঙ্কা ছিল. না জানি শ্রীমতী তাঁর ওপর কতখানি না কুপিত হয়েছেন। এমন সময় শ্রীমতীর এক সখী এসে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করলো এবং সেই সখীর মুখ থেকে শ্রীকৃষ্ণ শুনলেন, রাগ করা তো দূরে থাক, তাঁর অদর্শন-বিরহ সহ্য না করতে পেরে শ্রীমতী সূর্য্যতাপদগ্ধ কোমল কুসুমের মত শুকিয়ে উঠেছেন এবং তাঁরই দর্শনের জন্যে ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছেন। এই সংবাদ শুনে ভয়-ভীত শ্রীকৃষ্ণ স্নিগ্ধ হলেন, আশ্বস্ত হলেন।





কেশবধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে (বুদ্ধ-অবতার)

যমুনাতীরবানীরনিকুঞ্জে মন্দমাস্থিতম্
প্রাহ প্রেমভরোদ্‌ভ্রান্তং মাধবং রাধিকাসখী ॥ ১ ॥



যমুনার তীরে বেতসের বনে
ম্লানবিষণ্ন মুখে বসে থাকেন
উদ্‌ভ্রান্ত মাধব।
এমন সময় ধীরে ধীরে তাঁর কাছে এগিয়ে আসে
রাধিকার এক প্রিয়সখী ॥ ১ ॥

গীতম্

কর্ণাটরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্ ।
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্ ।
সা বিরহে তব দীনা
মাধবমনসিজবিশিখভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা ॥ ২ ॥



হে মাধব,
শ্রীমতী আজ তোমার বিরহে দীনা,
পঞ্চশরের বাণের আঘাতের ভয়ে
তোমার ধ্যানেতে নিয়েছে আশ্রয় ।
শীতল যে চন্দন, স্নিগ্ধ যে চাঁদের কিরণ
তাও আজ হয়ে উঠেছে অগ্নিজ্বালাময় ।
এমন যে দক্ষিণ পবন,
তাও আজ বিষের মতন করছে দহন,
কারণ চন্দনবন ছুঁয়ে আসতে
চন্দনতরু-কোটরের সর্প-বিষ মিশে যাচ্ছে তার অণুতে অণুতে ॥ ২ ॥

অবিরলনিপতিতমদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালম্‌ ।
স্বহৃদয়মর্ম্মণি বর্ম্ম করোতি সজলনলিনীদলজালম্‌ ॥ ৩ ॥

কুসুমবিশিখশরতল্পমনল্পবিলাসকলাকমনীয়ম্‌ ।
ব্রতমিব তব পরিরম্ভসুখায় করোতি কুসুমশয়নীয়ম্‌ ॥ ৪ ॥

রাধার হৃদয় লক্ষ্য ক'রে
অবিরল বর্ষিত হচ্ছে মদনের নিষ্ঠুর বাণ,
শ্রীমতীর আজ ভাবনা তোমারই জন্য,
কেননা সে-অন্তর জুড়ে রয়েছ তুমিই ।
তাই সেই বাণের আঘাত থেকে তোমাকে রক্ষা করবার জন্যেই
সজল শ্যামল পদ্মপাতায় দুই বক্ষ ঢেকে
শ্রীমতী নিজের বক্ষকে করেছে তোমার রক্ষা-বর্ম্ম ॥ ৩ ॥



তোমার কামকলায় মধুর যে কুসুমশয্যা
শ্রীমতীর কাছে আজ তা হয়েছে শরশয্যা ।
একদিন তুমি আবার সেই শূন্য শয্যায় করবে শয়ন
সেই আশায়,
ব্রত-ধারিণীর মত সে-নারী রচনা ক'রে
চলেছে কুসুমশয্যা ॥ ৪ ॥

বহতি চ বলিত-বিলোচন-জলধরমাননকমলমুদারম্ ।
বিধুমিব বিকটবিধুন্তুদদন্তদলনগলিতামৃতধারম্ ॥ ৫ ॥

বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতম্ ।
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নবচূতম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীমতীর নয়নে আজ ঘন মেঘভার,
সেই মেঘ গ'লে অবিরল পড়ছে ধারা বদনকমলে।
যেন রাহু আজ বিকট দন্ত-আঘাতে
চূর্ণ করতে চলেছে চন্দ্রমাকে,
চূর্ণিত চন্দ্র থেকে ঝরে পড়ছে অমৃতের ধারা ॥ ৫ ॥



নিভৃতে আজ শ্রীমতী
মৃগমদ দিয়ে রচনা করছে তোমার মূর্তি,
মদনের মূর্তিতে দেখছে তোমাকেই—
মূর্তির অধোদেশে এঁকেছে মকর,
হাতে দিয়েছে রসালমুকুলের শর,
আর ঘন ঘন করছে প্রণাম ॥ ৬ ॥

প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্ ।
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে তনুদাহম্ ॥ ৭ ॥

ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীবদুরাপম্ ।
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্ ॥ ৮ ॥



প্রণাম করে, আর বলে—
হে মাধব, এই নিলাম তোমার চরণ-শরণ,
তুমি যদি হও বিমুখ,
তাহলে সুধার নিধি স্নিগ্ধ চাঁদও
অগ্নি-দহনে করবে আমাকে দগ্ধ ॥ ৭ ॥

চিরদুর্লভ তুমি,
তোমাকে আজ ধ্যানে শ্রীমতী পেয়েছে অতি নিকটে,
আঁকা মূর্ত্তিই হয়ে উঠেছে তার কাছে সত্য,
তাই কখনো বিরহ নিবেদন ক'রে
কাঁদছে সেই মূর্ত্তির কাছে,
কাছে রয়েছ জেনে কখনো বা উঠছে হেসে,
যদি চলে যাও, সেই ভয়ে কখনো বা হয়ে উঠছে
বিষণ্ণ,
কখনো বা ফিরে এসেছ মনে ক'রে
কল্প-আলিঙ্গনে করছে হৃদয়ের জ্বালা দূর ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমধিকং যদি মনসা নটনীয়ম্ ।
হরিবিরহাকুলবল্লবযুবতী-সখীবচনং পঠনীয়ম্ ॥ ৯ ॥

আবাসো বিপিনায়তে প্রিয়সখীমালাপি জালায়তে
তাপোঽপি শ্বসিতেন দাবদহনজ্বালাকলাপায়তে ।
সাপি ত্বদ্বিরহেণ হন্ত হরিণীরূপায়তে হা কথং
কন্দর্পোঽপি যমায়তে বিরচয়ঞ্শার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্ ॥ ১০ ॥



অন্তরে যদি উপভোগ করতে চাও আনন্দরঙ্গ,
তাহলে ওগো পাঠক,
বারবার ক'রে পড়
হরিবিরহ-আকুল এই ব্রজযুবতীর সখীবচন ॥ ৯ ॥

হায় মাধব,
বিরহে তোমার,
শ্রীমতীর কাছে ঘর হয়েছে বন,
প্রিয়সখীদের মনে হচ্ছে বাধার জাল,
কন্দর্প যেন বধোদ্যত ব্যাঘ্র,
নিজেকে মনে হচ্ছে অসহায় বন-হরিণী
দাবানলের মধ্যে ব্যাঘ্রতাড়িতা হয়ে
পড়েছে ব্যাধের জালে ॥ ১০ ॥

গীতম্

দেশাগরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে

স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্ ।
রাধিকা তব বিরহে কেশব ॥ ১১ ॥

সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কম্
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্ ॥ ১২ ॥



হে কেশব,
বিরহে তোমার রাধার দেহ হয়েছে দুর্ব্বল ক্ষীণ,
স্তনলগ্ন হার বোধ হচ্ছে পাষাণভার ॥ ১১ ॥

হে কেশব,
বিরহে তোমার,
অঙ্গে মাখানো যে চন্দন-পঙ্ক
বিষ ব'লে তাকে লাগছে আতঙ্ক ॥ ১২ ॥

শ্বসিতপবনমনুপমপরিণাহম্
মদনদহনমিব বহতি সদাহম্ ॥ ১৩ ॥

দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালম্
নয়ননলিনমিব বিদলিতনালম্ ॥ ১৪ ॥



হে কেশব,
বিরহে তোমার,
শ্রীমতীর দেহ থেকে বিনির্গত হচ্ছে ঘননিঃশ্বাসভার,
যেন মদনের অগ্নিদাহের বাষ্প ॥ ১৩ ॥

হে কেশব,
বিরহে তোমার,
ছিন্ন-নাল সজল কমলের মত আশ্রয়-চ্যুতা
শ্রীমতীর সজল আঁখি আজ
ইতি-উতি চারিদিকে তোমাকেই ফিরছে খুঁজে ॥ ১৪



কেশবধৃত কল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে (কল্কি-অবতার)

নয়নবিষয়মপি কিশলয়তল্পম্
গণয়তি বিহিতহুতাশবিকল্পম্ ॥ ১৫ ॥

ত্যজতি ন পাণিতলেন কপোলম্
বালশশিনমিব সায়মলোলম্ ॥ ১৬ ॥



হে কেশব,
বিরহে তোমার
কচি কিশলয়ে গাঁথা শয্যা,
মনে হচ্ছে যেন প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড ॥ ১৫ ॥

হে কেশব,
বিরহে তোমার শ্রীমতী ব'সে আছে
করতলে রেখে কপোল,
যেন সন্ধ্যার ম্লান আকাশে
শিশু প্রতিপদের চাঁদ ॥ ১৬ ॥

হরিরিরিতি হরিরিরিতি জপতি সকামম্ ।
বিরহবিহিতমরণেব নিকামম্ ॥ ১৭ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমিতি গীতম্
সুখয়তু কেশবপদমুপনীতম্ ॥ ১৮ ॥

হে কেশব,
বিরহে তোমার শ্রীমতী জানে
সুনিশ্চিত তার মৃত্যু ।
তাই জন্মান্তরে যাতে
তোমাকেই পায়,



সেই আশায়,
শ্রীমতী দিবানিশি জপ করে চলেছে, হরি, হরি ॥ ১৭

হরিচরণে যারা সমর্পণ করেছে মন,
জয়দেব কবির এই গান
করুক তাদের সুখের বর্দ্ধন ॥ ১৮ ॥

সা রোমাঞ্চতি শীৎকরোতি বিলপত্যুৎকম্পতে তাম্যতি
ধ্যায়ত্যুদ্‌ভ্রাম্যতি প্রমীলতি পতত্যুদ্‌যাতি মূর্চ্ছত্যপি।
এতাবত্যতনুজ্বরে বরতনুর্জীবেন্ন কিন্তে রসাৎ
স্বর্বৈদ্যপ্রতিম প্রসীদসি যদি ত্যক্তোঽন্যথা হন্তকঃ ॥ ১৯ ॥

স্মরাতুরাং দৈবতবৈদ্যহৃদ্য ত্বদঙ্গসঙ্গামৃতমাত্রসাধ্যাম্।
বিমুক্তবাধাং কুরুষে ন রাধামুপেন্দ্রবজ্রাদপি দারুণোঽসি ॥ ২০ ॥



প্রেমজ্বরে আজ জরজর রাধার তনু।
কখনো বা উঠছে কেঁপে, কখনও বা বকছে প্রলাপ,
কখনো বা মূর্চ্ছিত হয়ে যাচ্ছে প'ড়ে।
কোন চিকিৎসাতেই সে-রোগের উপশম ঘটছে না।
স্বর্গ-বৈদ্যের মতন একমাত্র তুমি কেশব,
তুমি পার এই রোগের প্রকৃত ঔষধ দিতে।
অন্য আর যা কিছু ঔষধ, যা কিছু চিকিৎসা
সব হয়ে গিয়েছে ব্যর্থ ॥ ১৯ ॥

প্রেমজ্বরে মুমূর্ষু শ্রীমতীর একমাত্র ঔষধ হলো
হে মাধব, তোমার অঙ্গের স্পর্শ-সুধা,
আমি জানি তুমি স্বর্গ-বৈদ্যের চেয়ে চিকিৎসায় নিপুণ,
যদি তুমি উপযুক্ত ঔষধ দানে শ্রীমতীকে
না করো রোগমুক্ত
তাহলে বুঝবো, তুমি ইন্দ্রের বজ্রের চেয়েও কঠিন ॥ ২০ ॥

কন্দর্পজ্বরসংজ্বরাতুর-তনোরাশ্চর্য্যমস্যাশ্চিরং
চেতশ্চন্দনচন্দ্রমাঃ কমলিনীচিন্তাসু সন্তাম্যতি।
কিন্তু ক্ষান্তিরসেন শীতলতরং ত্বামেকমেব প্রিয়ং
ধ্যায়ন্তী রহসি স্থিতা কথমপি ক্ষীণা ক্ষণং প্রাণিতি ॥ ২১ ॥

ক্ষণমপি বিরহঃ পুরা ন সেহে
নয়ননিমীলন-খিন্নয়া যয়া তে।
শ্বসিতি কথমসৌ রসালশাখাং
চিরবিরহেণ বিলোক্য পুষ্পিতাগ্রাম্ ॥ ২২ ॥

প্রেমজ্বরে-জরজর-দেহ শ্রীমতীর মন আজ খুঁজছে,
শীতল চন্দন, স্নিগ্ধ চাঁদ আর সজল পদ্ম,—
কিন্তু সে-শীতলতায় দূর হচ্ছে না উত্তাপ।
তাই বিরলে ব'সে করছে তোমার ধ্যান,
গুণছে ক্ষণ কখন আসবে তুমি,



সেই আশাই হলো তার শীতলতার সার
তারই জন্যে এখনো যায়নি তার প্রাণ ॥ ২১ ॥

একদা যে রাধা
এক নিমেষের তোমার বিচ্ছেদ পারেনি সইতে,
নয়নের পলকপাতে যে হয়ে উঠতো ক্ষুণ্ণ,
আজ তার চোখের সামনে ফুটে উঠছে
মুকুলে মুকুলে রসালশাখা,
আজ কি করে সে সইবে
এই শেষহীন বিরহজ্বালা ? ॥ ২২ ॥

বৃষ্টিব্যাকুলগোকুলাবনরসাদুদ্ধৃত্য গোবর্দ্ধনং
বিভ্রদ্বল্লব-বল্লভাভিরাধিকানন্দাচ্চিরং চুম্বিতঃ
দর্পেণৈব তদর্পিতাধরতটী-সিন্দুরমুদ্রাঙ্কিতো
বাহুর্গোপতনোস্তনোতু ভবতাং শ্রেয়াংসি কংসদ্বিষঃ ॥ ২৩ ॥



বৃষ্টি-ব্যাকুল গোকুলে
যেদিন এসেছিল প্রলয়ের বন্যা,
সেদিন আকুল গোকুলবাসীদের রক্ষার জন্যে
দর্পভরে যে বাহু দিয়ে
শ্রীকৃষ্ণ ধারণ করেছিলেন গিরি-গোবর্দ্ধন,
কৃতজ্ঞতায় গোপীরা যে বাহু চুম্বন করতে গিয়ে
সীমন্তের সিন্দূরে করেছিল অনুরঞ্জিত,
কংসারি কৃষ্ণের সেই বাহু থেকে বর্ষিত হোক্
আপনাদের কল্যাণ,
নিখিলের কল্যাণ ॥ ২৩ ॥

চিত্রে জয়দেব
গীতগোবিন্দ

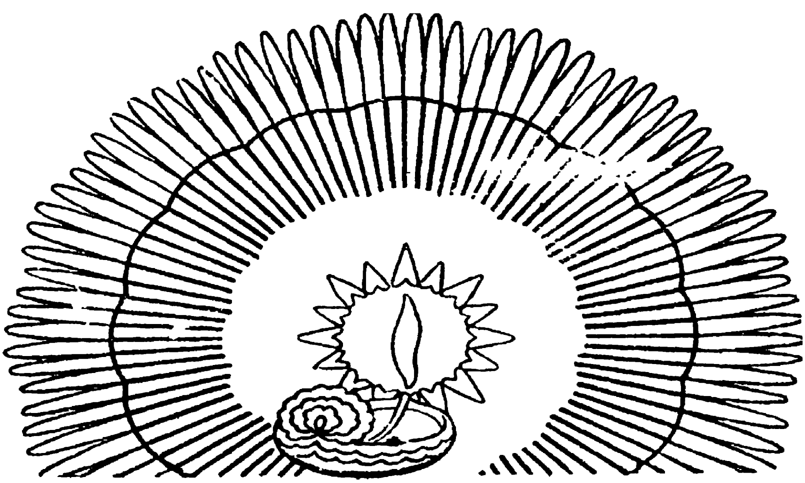


পঞ্চম সর্গ
সাকাঙ্ক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ

পঞ্চম সর্গ

সাকাঙ্ক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ

এই সর্গে কবি জয়দেব সঙ্গীর মুখ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা শ্রীমতীকে নিবেদন করছেন। সখীর মুখ থেকে শ্রীকৃষ্ণ যখন শুনলেন, তাঁর বিরহে শ্রীমতী মুমূর্ষু হয়ে উঠেছেন, তখনও কিন্তু তিনি নিজে শ্রীমতীর কাছে ছুটে যেতে পারলেন না। অন্যনারী সহবাসের দরুণ তাঁর মনে যে অপরাধ জমে উঠেছিল, তার ভয়ে মাধব শ্রীমতীর সেই নিদারুণ অবস্থা শুনেও যেতে পারলেন না। তিনি সখীকে অনুরোধ করলেন, তাঁর কথা শ্রীমতীকে জানিয়ে, শ্রীমতীকে যেন সখীরা তাঁর কাছে নিয়ে আসে। তাই সখী ফিরে এসে বিরহকাতরা শ্রীমতীকে শ্রীকৃষ্ণের হয়ে মিনতি করছে, শ্রীকৃষ্ণের দূতীরূপে তাঁর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা শ্রীমতীকে নিবেদন করছে এবং পরিশেষে আবেদন করছে, যেন তিনি হরি-অভিসারে এখুনি যাত্রা করেন।



অহমিহ নিবসামি যাহি রাধামনুনয় মদ্বচনেন চানয়েথাঃ।
ইতি মধুরিপুণা সখী নিযুক্তা স্বয়মিদমেত্য পুনর্জগাদ রাধাম্ ॥ ১ ॥



"ওগো সখি,
আমার মিনতি নিয়ে তুমি যাও শ্রীমতীর কাছে,
নিয়ে এসো তাকে এখানে,
আমি রইলাম এখানে তারই অপেক্ষায়।"
মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের এই মিনতি নিয়ে
সখী ফিরে আসে রাধার কাছে,
বলে···॥ ১ ॥

গীতম্

দেশবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে

বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায়
স্ফুটতি কুসুমনিকরে বিরহিহৃদয়দলনায়।
সখি হে সীদতি তব বিরহে বনমালী ॥ ২ ॥

দহতি শিশিরময়ূখে মরণমনুকরোতি।
পততি মদনবিশিখে বিলপতি বিকলতরোঽতি ॥ ৩ ॥



ওগো সখী, দেখে এলাম,
বিরহে তোমার ব্যথিত বনমালী।
সেই বিরহকে দ্বিগুণ ক'রে
বইছে দক্ষিণের মলয়ের আগুন,
ফুটে উঠেছে চারিদিকে সুগন্ধ কুসুম
গন্ধে যার উতলা করে বিরহীর মন ॥ ২ ॥

দেখলাম,
চাঁদের আলোয় তিনি মৃতপ্রায় পড়ে আছেন,
মদনের বাণে বিকল হয়ে বিলাপ করছেন ॥ ৩ ॥

ধ্বনতি মধুপসমূহে শ্রবণমপিদধাতি।
মনসি বলিতবিরহে নিশি নিশি রুজমুপযাতি ॥ ৪ ॥

বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতধাম।
লুঠতি ধরণিশয়নে বহু বিলপতি তব নাম ॥ ৫ ॥



চারদিক থেকে ওঠে অলিগুঞ্জন,
সে-গুঞ্জন নিবারণ করতে
দুহাত দিয়ে শ্রবণ করেন আচ্ছাদন।
প্রতিদিবসের শেষে আসে রজনী,
তুমি-হারা আঁধার রজনী,
প্রতি মুহূর্তে তাই ঘনতর হয়ে ওঠে মনোবেদনা ॥ ৪

সুখের আলয় ত্যাগ করে
তোমার জন্যে আজ তিনি হয়েছেন বনবাসী,
মুখে অহরহ শুধু তোমারই নাম,
ধূলায় লুটায়ে করছেন বিলাপ ॥ ৫ ॥

ভণতি কবিজয়দেবে হরি বিরহবিলসিতেন
মনসি রভসবিভবে হরিরুদয়তু সুকৃতেন ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বং যত্র সমং ত্বয়া রতিপতেরাসাদিতাঃ সিদ্ধয়-
স্তস্মিন্নেব নিকুঞ্জমন্মথমহাতীর্থে পুনর্মাধবঃ।
ধ্যায়ংস্ত্বামনিশং জপন্নপি তবৈবালাপমন্ত্রাক্ষরং
ভূয়স্তৎকুচকুম্ভনির্ভরপরীরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি ॥ ৭ ॥



কবি জয়দেবের ভণিত এই হরিবিরহকথা
তাঁদেরই জন্যে, প্রেমের ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত যাঁদের পুণ্য অন্তর ;
প্রার্থনা করি,
সে-অন্তরে জেগে উঠুন স্বয়ং শ্রীহরি ॥ ৬ ॥

একদিন যে কুঞ্জভবনে
তোমার সঙ্গে রতিক্রীড়ায় মাধব হয়েছিলেন পূর্ণমনোরথ,
আজ তুমি-শূন্য সেই প্রেমমহাতীর্থে
তেমনি অপেক্ষায় বসে আছেন মাধব,—
এই আশা নিয়ে,
কবে আবার তোমার কুচকুম্ভ-আলিঙ্গনের অমৃত স্বাদ পাবেন।'
অনুক্ষণ মনে মনে তাই তোমাকেই করছেন ধ্যান,
মন্ত্রের মতন করছেন জপ তোমারই প্রিয় নাম,
তোমারই আলাপের মধু-বাণী ॥ ৭ ॥

গীতম্

গুর্জ্জরীরাগৈকতালীতালভ্যাম্ গীয়তে

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্ ॥ ৮ ॥

ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি,
পীনপয়োধরপরিসরমর্দ্দনচঞ্চলকরযুগশালী ॥ ৯ ॥



ওগো সখি,
মদন-মনোহর-বেশে তোমার হৃদয়েশ্বর
অপরূপ রতিসুখের আশায় বেরিয়েছেন অভিসারে
ওগো নিতম্বিনি, আর বিলম্ব করো না,
এখুনি অনুসরণ কর তোমার প্রিয়তমের ॥ ৮ ॥

তোমার পীনপয়োধরকে মর্দ্দনে পীড়িত করবার জন্যে
চঞ্চল হয়ে উঠেছে বনমালীর করযুগল,
ধীরসমীর যমুনার তীরে
তোমারই জন্যে তাই অপেক্ষা করে রয়েছেন
বনমালী ॥ ৯ ॥

নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্
বহু মনুতে ননু তে তনুসঙ্গতপবনচলিতমপি রেণুম্ ॥ ১০ ॥

পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্ ।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্ ॥ ১১ ॥



তোমারই নাম নিয়ে মৃদু মৃদু বাজিয়ে চলেছেন
সঙ্কেত বাঁশী ;—
তোমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে যে বায়ু বইছে,
সে-বায়ুতে রয়েছে যে ধূলিকণা,
তোমার অঙ্গস্পর্শিত বলে সে ধূলিকণাকে
গায়ে মেখে ধন্য বোধ করছেন ॥ ১০ ॥

পাখী উড়ে এসে বসে গাছের ডালে,
সশব্দে নড়ে ওঠে গাছের পাতা,
সেই শব্দে তিনি সচকিত হয়ে ওঠেন
বুঝি বা তুমি এলে,
তাড়াতাড়ি শয্যা রচনা করতে যান,
আকুলভাবে চেয়ে থাকেন পথের দিকে ॥ ১১ ॥

মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্‌
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্‌ ॥ ১২ ॥
উরসি মুরারেরুপহিতহারে ঘন ইব তরলবলাকে
তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে রাজসি সুকৃতবিপাকে ॥ ১৩ ॥



সখি,
চরণ থেকে খুলে ফেল মুখর নূপুর,
চঞ্চল শব্দে নূপুর বিঘ্ন ঘটায় মিলন-কেলির।
বক্ষে জড়িয়ে নাও নীল নিচোল,
ত্বরায় চল আঁধার কুঞ্জভবনে
যেখানে রয়েছেন শ্যাম তোমারি অপেক্ষায় ॥ ১২ ॥

ঘন নীল মেঘে শুভ্র হংসবলাকার মত
শ্যামের নীলবক্ষে বিরাজ করছে শ্বেত গলহার।
ওগো সখি, বহুজন্মের পুণ্যের ফলে সেই শ্যামবক্ষে
বিপরীত-রতির সময়,
তুমি বিরাজ করবে অচঞ্চল বিদ্যুৎ ॥ ১৩ ॥

বিগলিতবসনং পরিহৃতরসনং ঘটয় জঘনমপিধানম্
কিশলয়নয়নে পঙ্কজনয়নে নিধিমিব হর্ষনিধানম্ ॥ ১৪ ॥



ওগো পদ্ম-আঁখি,
কুঞ্জ-ভবনে উপস্থিত হয়ে
যখন তুমি বসন দেবে ফেলে,
কুসুমশয্যায় শুয়ে যখন আবরণহীন
মুক্ত করবে জঘনদেশ,
আবরণ-মুক্ত রত্ন দেখলে যেমন আনন্দিত হয়ে
ওঠে লোক,
তেমনি আনন্দিত হয়ে উঠবেন শ্রীকৃষ্ণ ॥ ১৪ ॥

হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামম্
কুরু মম বচনং সত্বররচনং পূরয় মধুরিপুকামম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীজয়দেবে কৃতহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ম্ ।
প্রমুদিতহৃদয়ং হরিমতি সদয়ং নমত সুকৃতকমনীয়ম্ ॥ ১৬ ॥



তুমি জান সখি,
কত অভিমানী শ্রীহরি,
তার ওপর রজনীও হয়ে আসছে শেষ।
তাই বলি, কথা রাখ,
ত্বরায় সেখানে গিয়ে পূর্ণ কর শ্যামের বাসনা ॥ ১৫

শ্যামচরণসেবক জয়দেব কবি
গেয়ে চলে এই মধুর হরিকথা ;
হে সুধী, হে সজ্জন,
কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে—
করুন বন্দনা সেই সুকৃতবাঞ্ছিত করুণাময়
শ্রীহরির ॥ ১৬ ॥

বিকিরতি মুহুঃ শ্বাসানাশাঃ পুরো মুহুরীক্ষ্যতে।
প্রবিশতি মুহুঃ কুঞ্জং গুঞ্জন্মুহুর্বহু তাম্যতি।
রচয়তি মুহুঃ শয্যাং পর্য্যাকুলং মুহুরীক্ষতে
মদনকদনক্লান্তঃ কান্তে প্রিয়স্তব বর্ত্ততে ॥ ১৭ ॥



ওগো সখি,
আমি দেখে এলাম,
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে
শ্যামচন্দ্র বারবার চেয়ে দেখছেন সামনের
পথের দিকে।

তোমাকে দেখতে না পেয়ে
বিষণ্নমনে আবার প্রবেশ করছেন কুঞ্জভবনে।
সেখানেও তোমাকে দেখতে না পেয়ে
মৃদু আর্ত্তনাদে আবার আসছেন ফিরে।
বারবার ঘুরে এসে করছেন শয্যা রচনা,
কিন্তু হায়, শয্যা যে শূন্য,
তাই ব্যাকুল হয়ে চেয়ে দেখছেন চারিদিকে ॥ ১৭ ॥

তদ্বাম্যেন সমং সমগ্রমধুনা তিগ্মাংশুরস্তং গতো
গোবিন্দস্য মনোরথেন চ সমং প্রাপ্তং তমঃ সান্দ্রতাম্ ।
কোকানাং করুণস্বনেন সদৃশী দীর্ঘা মদভ্যর্থনা
তন্মুগ্ধে বিফলং বিলম্বনমসৌ রম্যোঽভিসারক্ষণঃ ॥ ১৮ ॥



হে সখি,
তোমার সঙ্গে শত্রুতা করবার জন্যে সূর্য্য
গিয়েছে অস্তাচলে,
শ্রীকৃষ্ণের অন্তরের মত গাঢ় হয়ে এসেছে অন্ধকার,
চক্রবাকীর মতন করুণস্বরে দীর্ঘকাল ধরে
আমিও করে চলেছি তোমাকে মিনতি,
তাই বলি ওগো মুগ্ধে,
আর বিলম্ব করে ব্যর্থ করো না এই মধুর অভিসার-
লগ্ন ॥ ১৮ ॥

আশ্লেষাদনু চুম্বনাদনু নখোল্লেখাদনু স্বান্তজ-
প্রোদ্বোধাদনু সংভ্রমাদনু রতামম্ভাদনু প্রীতয়োঃ।
অন্যার্থং গতয়োর্ভ্রমান্মিলিতয়োঃ সম্ভাষণৈর্জানতো
দম্পত্যোরিহ কো ন কো ন তমসি ব্রীড়াবিমিশ্রো রসঃ ॥ ১৯ ॥



ওগো সখি, আমি যেন দেখছি,
পরস্পর পরস্পরকে খুঁজতে খুঁজতে তোমরা
হয়েছ মিলিত,
প্রিয়-সম্ভাষণে পরস্পর পরস্পরকে চিনলে অন্ধকারে,
তারপর আলিঙ্গনে হলে বদ্ধ,
তারপর চুম্বন, নখাঘাত, কামকেলি…
রতিক্রীড়ার আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলো তোমাদের
দেহ-মন…
আমি চোখের সামনে দেখছি,
সেই অন্ধকারে রসতৃপ্ত তোমাদের মুখের
লজ্জা-মাখানো অপূর্ব্ব আনন্দ-শ্রী ॥ ১৯ ॥

সভয়চকিতং বিন্যস্যন্তীং দৃশৌ তিমিরে পথি
প্রতিতরু মুহুঃ স্থিত্বা মন্দং পদানি বিতন্বতীম্ ।
কথমপি রহঃ প্রাপ্তামঙ্গৈরনঙ্গতরঙ্গিভিঃ
সুমুখি সুভগঃ পশ্যন্ স ত্বামুপৈতু কৃতার্থতাম্ ॥ ২০ ॥



ওগো সুমুখি,
এই সন্ধ্যার অন্ধকারে সভয়চকিত দৃষ্টিপাতে
তুমি অগ্রসর হও প্রিয়-মিলনে,
অন্ধকারে কেউ পাবে না তোমাকে দেখতে ;
মাঝে মাঝে তরুতলে ক্ষণিক থেমে বিশ্রাম
করে নিও,
তারপর সেই নির্জন কুঞ্জবনে
শ্রীকৃষ্ণ যখন তোমার প্রেমতরঙ্গায়িত তনুর স্পর্শ
পাবেন
আমি জানি সখি,
কৃতার্থতায় ভরে যাবে শ্যামের অন্তর ॥ ২০ ॥

রাধামুগ্ধমুখারবিন্দ মধুপস্ত্রৈলোক্যমৌলিস্থলী-
নেপথ্যোচিত-নীলরত্নমবনী-ভারাবতারান্তকঃ।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীজন-মনস্তোষ-প্রদোষশ্চিরং
কংসধ্বংসন-ধূমকেতুরবতু ত্বাং দেবকীনন্দনঃ ॥ ২১ ॥



শ্রীরাধার মুখপদ্মের মধু পান করে যে মধুকর,
ত্রিলোকের মুকুটস্বরূপ যে বৃন্দাবন ধাম, তার যে
ভূষণস্বরূপ নীলরত্ন,
ধরার ভার লাঘব করবার জন্যে যিনি কৃতান্তের
স্বরূপ,
প্রিয়-মিলনে মধুর প্রদোষের অন্ধকারের মতন
যিনি গোপীজনদের কামনার ধন,
কংসারি সেই দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করুন
আপনাদের সকলকে ॥ ২১।

চিত্রে জয়দেব
গীতগোবিন্দ



ষষ্ঠ সর্গ
ধৃষ্টবৈকুণ্ঠ

ষষ্ঠ সর্গ

ধৃষ্টবৈকুণ্ঠ

সখীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের বিরহের নিদারুণ অবস্থা শুনেও শ্রীমতী লতাকুঞ্জ ত্যাগ করে অভিসারে বেরুলেন না। অন্তর চাইছে এখনি ছুটে যেতে কিন্তু দুর্জ্জয় অভিমান শৃঙ্খলের মতন পায়ে থাকে জড়িয়ে। অপরাধী নিজে না এলে বুঝি এ অভিমান ভাঙবে না। সখীরা কি করবে ভেবে ঠিক করতে পারে না। রাধাকৃষ্ণের মিলন ছাড়া তাদের যে নেই আর কোন আনন্দ। তাই সখী আবার ফিরে চলে শ্রীকৃষ্ণের কাছে। শ্রীমতীর নিদারুণ অভিমানের কথা ঢেকে শ্রীকৃষ্ণকে বলে, কৃষ্ণ-বিরহে রাধার কি মর্ম্মান্তিক ব্যথা! যদি তাতে চঞ্চল হয়ে ওঠে শ্রীকৃষ্ণের মন-বৈকুণ্ঠ, অপরাধের ভয় ভুলে গিয়ে যদি শ্রীমতীর মান রাখবার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ উপযাচক হয়ে আসেন শ্রীমতীর কুঞ্জে। সেই রসই পরিবেশন করেছেন জয়দেব কবি এই সর্গে।



অথ তাং গন্তুমশক্তাং চিরমনুরক্তাং লতাগৃহে দৃষ্ট্বা।
তচ্চরিতং গোবিন্দে মনসিজমন্দে সখী প্রাহ ॥ ১



লতাগৃহে লীনা চির-অনুরাগিণী শ্রীমতী তবু হায়,
প্রিয়-অভিসারে পারলেন না যেতে।
তাই দেখে সখী শ্রীমতীর কাছ থেকে
পুনরায় এলো প্রেম-পীড়িত শ্যামের কাছে ॥ ১ ॥

গীতম্

গোণ্ডাকিরীরাগেণ রূপকতালেনচ গীয়তে

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্ ।
তদধরমধুরমধুনি পিবন্তম্ ॥
নাথ হরে সীদতি রাধা বাসগৃহে ॥ ২ ॥



শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসে সখী বলে,
হে নাথ, হে শ্রীহরি,
লতাগৃহে তোমারি জন্যে বিষাদে কাঁদছে শ্রীমতী ।
তার মধুর অধরের সুধা তোমারই জন্য,
সেই তোমাকেই আকুলভাবে চারদিকে দেখছে ॥ ২ ॥

ত্বদভিসরণরভসেন বলন্তী
পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী ॥ ৩ ॥

বিহিতবিশদবিসকিশলয়বলয়া
জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া ॥ ৪ ॥



দেখলাম,
অন্তরের আকুল আগ্রহে
তিনি অভিসারের জন্যে পা বাড়ালেন,
কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই
অবশ হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন ॥ ৩ ॥

পদ্মের কিশলয় আর পল্লবের বলয় ধারণ করে
তিনি কোনরকমে বেঁচে আছেন
তোমারি প্রেমরতির আশায় ॥ ৪ ॥

মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ॥ ৫ ॥

ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারম্ ।
হরিরিতি বদতি সখীমনুবারম্ ॥ ৬ ॥



নিজের বেশ পরিবর্ত্তন করে,
শ্রীমতী তোমারি মতন করেছেন বেশভূষা
নিজের দিকে চেয়ে মনে মনে ভাবছেন
তিনিই যেন শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৫ ॥

কেন শ্যাম আসছেন না অভিসারে,
বারে বারে করছেন সখীদের সেই প্রশ্ন ॥ ৬ ॥

শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পম্ ।
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পম্ ॥ ৭ ॥

ভবতি বিলম্বিনি বিগলিতলজ্জা
বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা ॥ ৮



শ্যামদেহ তুমি এসেছ মনে করে
কখন বা মেঘসদৃশ গাঢ় অন্ধকারকেই করছেন
আলিঙ্গন আর চুম্বন ॥ ৭

আবার কখনও বা,
তোমার আগমন বিলম্ব দেখে
বাসকসজ্জায় উঠছেন বিলাপ করে,
কেঁদে উঠছেন সকল লজ্জা ত্যাগ করে ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতম্
রসিকজনং তনুতামতিমুদিতম্ ॥ ৯ ॥

বিপুলপুলকপালিঃ স্ফীতশীৎকারমন্ত-

তব কিতব বিধায়ামন্দকন্দর্পচিন্তাং
রসজলধিনিমগ্না ধ্যানলগ্না মৃগাক্ষী ॥ ১০ ॥



কবি জয়দেবের বিরচিত এই গানে
জেগে উঠুক পরমানন্দ
রসিকজনের অন্তরে ॥ ৯ ॥

ওহে শঠ,
তোমারই ভাবনায় ব্যাকুল
তোমারই প্রেমসাগরে নিমগ্ন
সেই মৃগনয়না
তোমারি ধ্যানে আছে জীবনধারণ করে।
কখনো উঠছে রোমাঞ্চিত হয়ে, করছে শীৎকার,
কখনো বা মনোবেদনায় উঠছে ব্যাকুল বিলাপ
করে ॥ ১০ ॥

অঙ্গেষ্বাভরণং করোতি বহুশঃ পত্রেঽপি সঞ্চারিণি
প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে বিতনুতে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি।
ইত্যাকল্পবিকল্পতল্পরচনাসঙ্কল্পলীলাশত-
ব্যাসক্তাপি বিনা ত্বয়া বরতনুর্নৈষা নিশাং নেষ্যতি ॥ ১১ ॥



তুমি আসছো মনে করে
ত্বরায় অঙ্গে পরছেন অলংকার,
তুমি আসনি দেখে
আবার তখুনি খুলে ফেলছেন সব।
বাতাসে নড়ে উঠছে গাছের পাতা,
মনে হয় যেন তুমি আসছো,
তাড়াতাড়ি তোমার জন্যে করে শয্যা রচনা।
কখনো বা তোমার ধ্যানে হয়ে থাকে স্তব্ধ।
এইভাবে বেশ পরতে আর বেশ খুলতে,
পথ চেয়ে থাকতে থাকতে আর শয্যা রচনা করতে করতে,
তোমার চিন্তায় আর সংকল্পে
অসহ্য হয়ে উঠেছে তার নিশিযাপন ॥ ১১ ॥

কিং বিশ্রাম্যসি কৃষ্ণভোগিভবনে ভাণ্ডারভূমিরুহি
ভ্রাতর্যাহি ন দৃষ্টিগোচরামতঃ সানন্দনন্দাস্পদম্ ।
রাধায়া বচনং তদধ্বগমুখান্নন্দান্তিকে গোপতো
গোবিন্দস্য জয়ন্তি সায়মতিথি-প্রাশস্ত্যগর্ভা গিরঃ ॥ ১২ ॥



ওহে পথিক, কেন বিশ্রাম করছো
এই কালসর্প-সমাকুল বটতরুমূলে ?
ঐ অদূরে রয়েছে দেখ আনন্দময় নন্দ-আলয়,
ঐখানে যাও !
শ্রীরাধার ঐ বচন নন্দগোপের কাছে
পথিক কৌশলে করে গোপন ;
তার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ পথিককে করেছিলেন যে প্রশংসা,
তাতে নন্দিত হোক্ তোমার হৃদয়, হে পাঠক ! ॥ ১২ ।

চিত্রে জয়দেব
গীতগোবিন্দ



সপ্তম সর্গ
নাগর নারায়ণ

সপ্তম সর্গ

নাগর নারায়ণ

রাত্রি গভীর হয়ে আসে, মাথার উপরে আকাশে স্ফুটতর হয়ে ওঠে বৃন্দাবনের নিশীথচন্দ্র। শ্রীমতী অসহ বিরহ-ব্যথায় কুঞ্জভবনে বসে থাকেন শ্যামের প্রতীক্ষায়। কিন্তু শ্যাম আসে না। শুকিয়ে ওঠে অঙ্গের মৃগমদচন্দন, শুকিয়ে ওঠে গলার মালতীহার। সখী গিয়েছে শ্যামচন্দ্রকে নিয়ে আসবার জন্যে, সামান্য শব্দ হয়, তিনি উচ্চকিত হয়ে ওঠেন, এই বুঝি শ্যামকে নিয়ে সখী ফিরে এলো। সখী ফিরে এলো কিন্তু একা। অশ্রু-জলে শ্রীমতী বুঝলেন তাঁর নারায়ণ আজ নাগররূপে অন্য নারীর সঙ্গে করছেন নিশিযাপন। সখীর কাছে কেঁদে ভেঙ্গে পড়েন শ্রীমতী। তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে, অন্য নারীর সঙ্গে প্রেম-রত মাধবের ছবি, নাগর নারায়ণের ছবি। শ্রীমতীর কাতর বিলাপের মধ্য দিয়ে কবি জয়দেব এই সর্গে মাধবের সেই পর-নারী-প্রেম-লীলার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।



অত্রান্তরে চ কুলটাকুলবর্ত্মপাতসঞ্জাতপাতক ইব স্ফুটলাঞ্ছনশ্রীঃ।
বৃন্দাবনান্তরমদীপয়দংশুজালৈর্দিক্‌সুন্দরীবদনচন্দনবিন্দুরিন্দুঃ ॥ ১ ॥

প্রসরতি শশধরবিম্বে বিহিতবিলম্বে চ মাধবে বিধুরা।
বিরচিতবিবিধবিলাপং সা পরিতাপং চকারোচ্চৈঃ ॥ ২ ॥



বৃন্দাবনের আকাশে ফুটে ওঠে চাঁদ,—
দিকবধূর বদনে যেন চন্দনবিন্দু।
কুলটা নারীর গোপন-অভিসারে
আলোর বিঘ্ন ঘটানোর অপরাধে
বুকে তার কলঙ্ক-চিহ্ন ॥ ১ ॥

গীতম্

মালবরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে

কথিতসময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনম্‌ ।
মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্‌ ।
যামি হে কমিহ শরণং সখীজনবচনবঞ্চিতা ॥ ৩ ॥



ক্রমশঃ চাঁদ আকাশে স্ফুটতর হয়ে ওঠে,
কিন্তু আসে না মাধব ।
বিষাদে শ্রীমতী করেন বিলাপ
বিবিধ আকুল ভঙ্গিমায় ॥ ২ ॥

কথিত সময় কখন চলে গেল,
তবু এলো না হরি ।
বিফলে চলে যায় এই অমলিন রূপযৌবন ।
হায় ! সখীরাও করলো আমাকে বঞ্চনা,
এখন আমি কার শরণ নিই ? ॥ ৩ ॥

যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতম্ ।
তেন মম হৃদয়মিদমসমশরকীলিতম্ ॥ ৪

মম মরণমেব বরমতি বিতথকেতনা
কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা ॥ ৫



হায়, যার জন্যে এই রাত্রি-নিশীথে
আসতে হলো আমাকে গহন বনে,
সেই আমাকে নিষ্ঠুরের মত
বিদ্ধ করলো মদনের শরে ॥ ৪ ॥

এখন আমার মরণই ভাল,
অচেতন এই ব্যর্থ দেহে
বিরহানলে দগ্ধ হওয়ায় কি লাভ ? ॥ ৫ ॥

মামহহ বিধুরয়তি মধুরমধুযামিনী
কাপি হরিমনুভবতি কৃতসুকৃতকামিনী ॥ ৬ ॥

অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণম্ ।
হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণম্ ॥ ৭ ॥



এই মধুর বাসন্তী নিশা
আমাকে করছে যন্ত্রণায় দগ্ধ,
কিন্তু কোন্ সে পুণ্যবতী নারী
এমন মধুযামিনীতে ভাসছে
হরি-মিলনের সুখের আনন্দে ॥ ৬ ॥

প্রিয় আসবে বলে
অঙ্গে ধারণ করলাম মণিবলয়ের ভূষণ,
এখন হরিবিরহে
সেই ভূষণ হলো বেদনার বিষ-কণ্টক ॥ ৭ ॥

কুসুমসুকুমারতনুমতনুশরলীলয়া
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষমশীলয়া ॥ ৮ ।

অহমিহ নিবসামি ন গণিতবনবেতসা ।
স্মরতি মধুসূদনো মামপি ন চেতসা ॥ ৯ ॥



হায়,
আমারই বুকের এই ফুলহার,
কুসুম সুকুমার আমার এই অসহায় দেহ
মদন শরের মতন দিচ্ছে যাতনা ॥ ৮ ॥

যার জন্যে,
এই গহন বেতসবনে এলাম
সব ভয় তুচ্ছ করে,
সেই মধুসূদনই তাঁর মন থেকে
আমাকে দিলো নির্ব্বাসন ॥ ৯ ॥

হরিচরণশরণ জয়দেবকবিভারতী।
বসতু হৃদি যুবতিরিব কোমলকলাবতী ॥ ১০ ॥

তৎ কিং কামপি কামিনীমভিসৃতঃ কিম্বা কলাকেলিভি-
র্বদ্ধো বন্ধুভিরন্ধকারিণি বনাভ্যর্ণে কিমুদ্ভ্রাম্যতি।
কান্তঃ ক্লান্তমনা মনাগপি পথি প্রস্থাতুমেবাক্ষমঃ
সঙ্কেতীকৃত মঞ্জুরবঞ্জুললতা কুঞ্জেঽপি যন্নাগতঃ ॥ ১১ ॥



হরিচরণে শরণাগত কবি জয়দেব,
তাঁর এই গান,
কোমল কলাবতী নারীর মত
অন্তর জয় করুক ভক্তজনের ॥ ১০ ॥

তবে কি হরি আজ
অন্য নারীর অভিসারে করেছেন যাত্রা ?
না, বন্ধুরা খেলাচ্ছলে তাঁকে রেখেছেন আটকে ?
কিম্বা অন্ধকার বনপথে হারিয়ে ফেলেছেন পথ ?
পথশ্রমে অবসন্নদেহ বসে পড়েছেন কোন্ অজানা
তরুতলে ?
তিনিই দিয়েছিলেন সঙ্কেত, এই বেতসকুঞ্জে হবে দেখা,
কেন এলেন না তিনি ? ॥ ১১ ॥

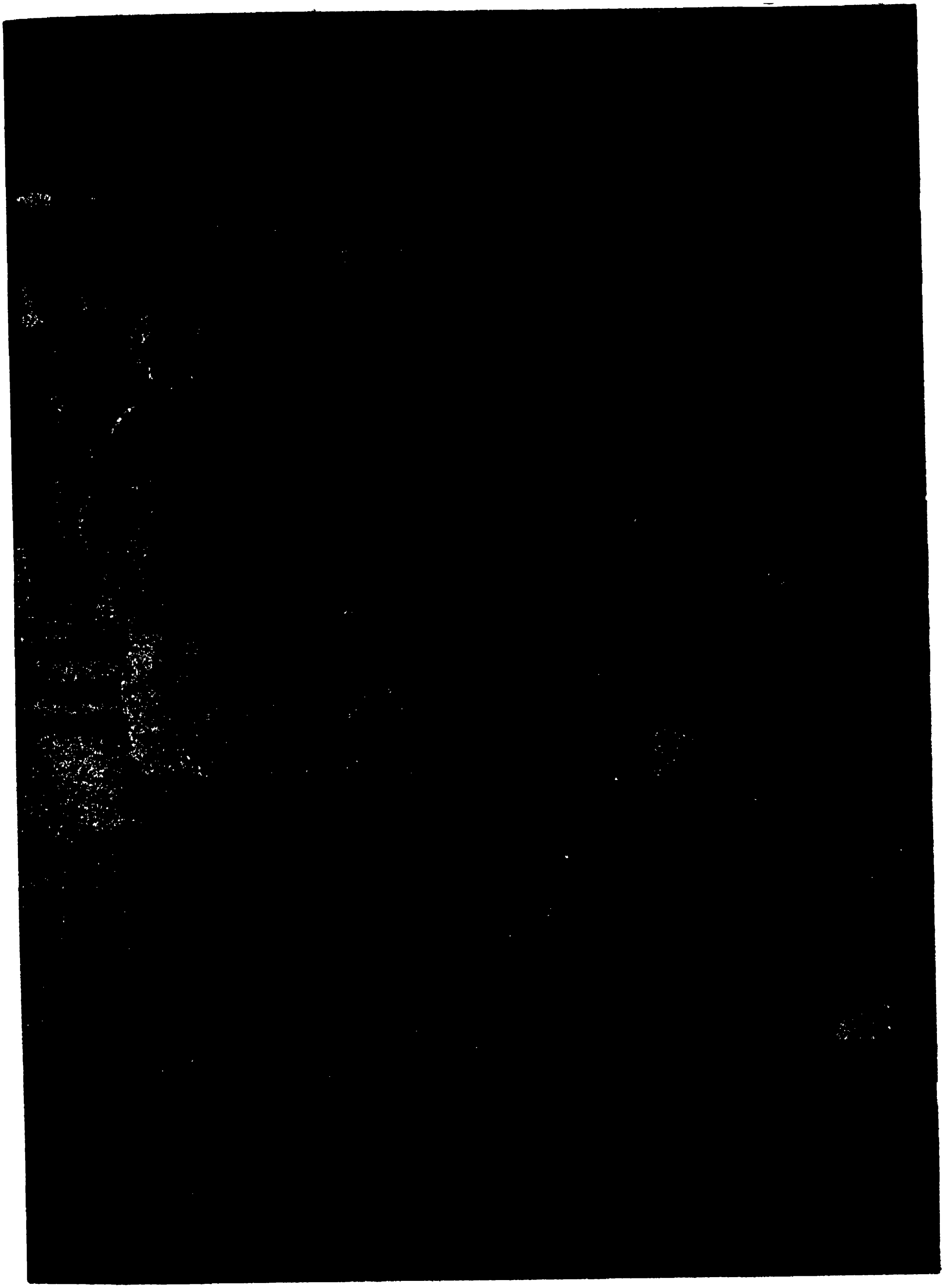
অথাগতাং মাধবমন্তরেণ সখীমিয়ং বীক্ষ্য বিষাদমূকাম্ ।
বিশঙ্কমানা রমিতং কয়াপি জনার্দ্দনং দৃষ্টবদেতদাহ ॥ ১২ ॥



(যখন শ্রীমতী এই রকম চিন্তা করছেন)

সেই সময় মাধবের কাছ থেকে ফিরে এলো সখী,
একাকিনী, বিষাদে নির্ব্বাক মুখ ।
তাই না দেখে শ্রীমতী চিন্তায় হয়ে উঠলেন ব্যাকুল,
নিশ্চয়ই মাধব তাহলে গিয়েছেন অন্য নায়িকার
অভিসারে ।

চোখের সামনে ফুটে ওঠে মাধবের মোহনমূর্ত্তি,
শ্রীমতী বিষাদে বলে ওঠেন... ॥ ১২ ॥



ধনী, অলপ বয়সি বালা

গীতম্

বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে

স্মরসমরোচিতবিরচিতবেশা
গলিতকুসুমদরবিলুলিতকেশা ॥
কাপি মধুরিপুণা বিলসতি যুবতিরধিকগুণা ॥ ১৩ ॥

হরিপরিরম্ভণবলিতবিকারা
কুচকলসোপরি তরলিতহারা ॥ ১৪ ॥



কেশপাশ-পড়েছে শিথিল হয়ে,
শিথিল কবরী থেকে খসে পড়ছে
ফুলদল,
প্রেমরণে সুসজ্জিতা আমার ন্যায়
গুণবতী অন্য কোন নারী
মনে হয় আজ মিলিত হয়েছে মাধবের সঙ্গে ॥ ১৩ ॥

আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,
শ্রীহরির আলিঙ্গনের পুলকচাঞ্চল্যে
কুচকলসের ওপর দুলে উঠছে
সে-নারীর বক্ষহার ॥ ১৪ ॥

বিচলদলকললিতাননচন্দ্রা
তদধরপানরভসকৃততন্দ্রা ॥ ১৫ ॥

চঞ্চলকুণ্ডলললিতকপোলা
মুখরিতরসনজঘনগতিলোলা ॥ ১৬ ॥



দেখছি,
সে-নারীর মুখচন্দ্রে
উড়ে উড়ে এসে পড়ছে চূর্ণ অলক,
শ্রীহরির চুম্বন-সুখে
ঢুলু ঢুলু মুদে আসছে তার আঁখি ॥ ১৫ ॥

ললিত কপোলে তার দুলছে মণিকুণ্ডল,
মুখর হয়ে উঠছে মেখলা
ঘন ঘন জঘনের সঞ্চালনে ॥ ১৬ ॥

দয়িতবিলোকিতলজ্জিতহসিতা
বহুবিধকূজিত রতিরসরসিতা ॥ ১৭ ॥

বিপুলপুলকপৃথুবেপথুভঙ্গা ।
শ্বসিত নিমীলিতবিকসদনঙ্গা ॥ ১৮ ॥



বাঞ্ছিতকে বুকে পেয়ে
কখনো বা প্রেমলাজে লজ্জিত হয়ে উঠছে সে,
কখনো বা আনন্দে হাসছে,
রতিরসে বিভোর হয়ে
কখনো বা করছে কত না অস্ফুট ধ্বনি ॥ ১৭ ॥

কখনও বা সে-নারী
বিপুল পুলকে উঠছে কেঁপে কেঁপে,
কখনও বা ঘন শ্বাস ফেলে,
কখনো বা দুচোখ মেলে প্রকাশ করছে
রতিরঙ্গ ॥ ১৮ ॥

শ্রমজলকণভর সুভগশরীরা।
পরিপতিতোরসি রতিরণধীরা ॥ ১৯ ॥

শ্রীজয়দেবভণিত হরিরমিতম্।
কলিকলুষং জনয়তু পরিশমিতম্ ॥ ২০ ॥



আমি দেখছি,
প্রেমকেলিতে ক্লান্ত সেই
সুভগ নারীর দেহ
শ্রমবারিতে হয়েছে সিক্ত,
রতিরণ-নিপুণা সে-নারী
আবেশে লুটিয়ে পড়ছে
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে ॥ ১৯ ॥

শ্রীজয়দেব কবির এই হরিপ্রেমলীলা
দূর করুক সর্ব্বজনের কলি-কলুষ-ভার ॥ ২০ ॥

[একশ' ছাপ্পান্ন]

বিরহপাণ্ডুমুরারিমুখাম্বুজ-
দ্যুতিরিয়ং তিরয়ন্নপি বেদনাম্ ।
বিধুরতীব তনোতি মনোভুবঃ
সুহৃদয়ে হৃদয়ে মদনব্যথাম্ ॥ ২১ ॥



রাত্রি-অবসানের বার্তা নিয়ে
মদনের বন্ধু চন্দ্র যাচ্ছে অস্ত,
অন্তরে কমে আসছে বেদনার ভার ;
কিন্তু,
রাত্রি-শেষের এই পাণ্ডুর চাঁদের মুখ
স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে মাধবের ম্লান মুখপদ্ম,
আবার মদনব্যথায় ব্যথিত হয়ে উঠছে অন্তর ॥ ২১ ॥

গীতম্
গুর্জ্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে

সমুদিতমদনে রমণীবদনে চুম্বনবলিতাধরে।
মৃগমদতিলকং লিখতি সপুলকং মৃগমিব রজনীকরে।
রমতে যমুনাপুলিনবনে বিজয়ী মুরারিরধুনা ॥ ২২ ॥

ঘনচয়রুচিরে রচয়তি চিকুরে তরলিততরুণাননে।
কুরুবককুসুমং চপলাসুষমং রতিপতিমৃগকাননে ॥ ২৩ ॥

যমুনার তীরে কুঞ্জভবনে
প্রেম-বিহার করে বিজয়ী শ্রীহরি।



প্রেম-জাগানিয়া নায়িকার মুখচাঁদে
চুম্বনে বলিত হয়েছে অধর,
শশিকলঙ্কের মতন
তাতে এঁকে দেন মৃগমদচিহ্ন ॥ ২২ ॥

ঘন মেঘভারের মত যে নায়িকার কেশদামে
মদন পেয়েছে তার বিহারের বন,
আনন্দে নিজের হাতে মাধব গেঁথে দেন তাতে
কুরুবকফুলের বিদ্যুৎ ॥ ২৩ ॥

ঘটয়তি সুঘনে কুচযুগগগনে মৃগমদরুচিরূষিতে।
মণিসরমমলং তারকপটলং নখপদশশিভূষিতে ॥ ২৪ ॥

জিতবিসশকলে মৃদুভুজযুগলে করতলনলিনীদলে।
মরকতবলয়ং মধুকরনিচয়ং বিতরতি হিমশীতলে ॥ ২৫ ॥



নায়িকার ঘন কুচগগনে
দেখা যায় তাঁর নখরেখার চাঁদ,
সেখানে দুলিয়ে দেন মণিরত্নের হার,
আকাশ ভরে ওঠে যেন তারায় ॥ ২৪

স্নিগ্ধ করতল তার যেন পদ্মশীতল,
ভুজযুগ তার সুগোল মৃণাল,
সেই পদ্মমৃণালে ভ্রমরের দলের মতন
শোভা পায় মরকতনীলা,
যখন শ্রীহরি পরিয়ে দেন স্বর্ণ-বলয় ॥ ২৫ ॥

রতিগৃহজঘনে বিপুলাপঘনে মনসিজকনকাসনে
মণিময়রসনং তোরণহসনং বিকিরতি কৃতবাসনে ॥ ২৬ ॥

চরণকিশলয়ে কমলানিলয়ে নখমণিগণপূজিতে।
বহিরপবরণং যাবকভরণং জনয়তি হৃদি যোজিতে ॥ ২৭ ॥



শ্রীহরি পরিয়ে দিচ্ছেন স্বর্ণকাঞ্চী
নায়িকার সঘন জঘন দেশে,
সে তো জঘন নয়,
সে যেন রতির ঘরে মদনের কনকাসন।
তোরণে মঙ্গলমালার মত
দোলে সে কনককাঞ্চী ॥ ২৬ ॥

নখমণিশোভিত সেই সুন্দরীর চরণপদ্ম
বক্ষে ধারণ করেছেন শ্রীহরি,
বক্ষে ধারণ করে
রঞ্জিত করছেন তাকে অলক্তকে ॥ ২৭ ॥

রময়তি সুভৃশং কামপি সুদৃশং খলহলধরসোদরে।
কিমফলবসং চিরমিহ বিরসং বদ সখি বিটপোদরে ॥ ২৮ ॥

ইহ রসভণনে কৃতহরিগুণনে মধুরিপুপদসেবকে।
কলিযুগচরিতং ন বসতু দুরিতং কবিনৃপজয়দেবকে ॥ ২৯ ॥



হায় সখি,
হলধরের সোদর সেই খল শ্রীহরি,
যদি অপর নায়িকার সঙ্গেই আনন্দে করেন বিহার,
তবে আর কেন আমি শুষ্কমুখে
বসে থাকি এই বনভবনে ? ॥ ২৮ ॥

মধুবিনাশন মুরারির চরণসেবক
কবিরাজ জয়দেবের এই হরিগুণগান,
যে করে শ্রবণ,
দূর হয়ে যায় তার কলিযুগ-পাপভার ॥ ২৯ ॥

নায়াতঃ সখি নির্দ্দয়ো যদি শঠস্ত্বং দূতি কিং দূয়সে
স্বচ্ছন্দং বহুবল্লভঃ স রমতে কিং তত্র তে দূষণম্ ।
পশ্যাদ্য প্রিয়সঙ্গমায় দয়িতস্যাকৃষ্যমাণং গুণৈ-
রুৎকণ্ঠার্ত্তিভরাদিব স্ফুটদিদং চেতঃ স্বয়ং যাস্যতি ॥ ৩০ ॥



ওগো সখি, ওগো দূতি,
যদি সে-নিষ্ঠুর আমার সঙ্গে শঠতা ক'রে
নাই এলো কুঞ্জভবনে,
তাতে তুমি কেন হচ্ছো কুণ্ঠিত ?
আমি জানি সে বহুবল্লভ,
আনন্দে করে বহু নায়িকার সঙ্গে বিহার,
তাতে তোমার কি দোষ বল ?
আর দেরী নেই সখি,
দয়িতের গুণে আকৃষ্ট হয়ে
হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে
এখুনি চলবে আমার প্রাণ অভিসারে,
অবিচ্ছেদ প্রিয়-মিলনের আশায় ॥ ৩০ ॥

গীতম্

দেশবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে

অনিলতরল কুবলয়নয়নেন
তপতি ন সা কিশলয়শয়নেন।
সখি যা রমিতা বনমালিনা ॥ ৩১ ॥

বিকসিতসরসিজললিতমুখেন।
স্ফুটতি ন সা মনসিজবিশিখেন ॥ ৩২ ॥



ওগো সখি,
পবনে চঞ্চল নীলকমলের মত
যার চঞ্চল-নয়ন,
সে চঞ্চল বনমালীর সঙ্গে যে করেছে রমণ,
পল্লবশয্যায় আর তার লাগে না তাপ ॥ ৩১ ॥

বিকশিত পদ্মের মত যার মুখ,
সেই মুখ দিয়ে যাকে সে করেছে চুম্বন,
সে-চুম্বিত মুখ
আর হয় না মদনের বাণে বিদ্ধ ॥ ৩২।

অমৃতমধুর মৃদুতরবচনেন
জ্বলতি ন সা মলয়জপবনেন ॥ ৩৩ ॥

স্থলজলরুহরুচিকরচরণেন
লুঠতি ন সা হিমকরকিরণেন ॥ ৩৪ ॥



যে হয়েছে অভিষিক্ত
তার অমৃত-মধুর মৃদুবচনে,
কি আর জ্বালা দেবে তাকে
মলয়-পবন ? ॥ ৩৩ ॥

স্থলপদ্মের মত তার
শ্রীকর আর চরণ যে করেছে স্পর্শ,
চাঁদের আলোর স্পর্শে
জাগে না আর তার সন্তাপ ॥ ৩৪ ॥

সজলজলদসমুদয়রুচিরেণ।
দলতি ন সা হৃদি বিরহভরেণ ॥ ৩৫ ॥

কনকনিকষরুচিশুচিবসনেন।
শ্বসিতি ন সা পরিজনহসনেন ॥ ৩৬ ॥



সজল মেঘের মত শ্যামল সে,
যাকে একবার করেছে আলিঙ্গন,
বিরহ আর পারে না নতুন ক'রে
দহন করতে তার হৃদয় ॥ ৩৫ ॥

সেই পীতবসনে শ্রীহরি
যার সঙ্গে একবার করেছেন বিহার,
প্রিয়জনের পরিহাসে
আর সে ফেলে না দীর্ঘশ্বাস ॥ ৩৬ ॥

সকলভুবনজনবরতরুণেন ।
বহতি ন সা রুজমতিকরুণেন ॥ ৩৭ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতবচনেন ।
প্রবিশতু হরিরপি হৃদয়মনেন ॥ ৩৮ ॥



নিখিলভুবনে যত আছে তরুণ,
তিনি হলেন তাদের সকলের চেয়ে তরুণ,
সেই চিরতরুণ যার সঙ্গে করেছে রমণ
কেন আর কাঁদবে সে করুণভাবে ? ॥ ৩৭ ॥

শ্রীজয়দেব গাইলেন
যে রাধাবিরহসঙ্গীত,
সে-সঙ্গীতের সুরে সুরে
অন্তরে প্রবেশ করুন শ্রীহরি ॥ ৩৮ ॥

মনোভবানন্দনচন্দনানিল
প্রসীদ রে দক্ষিণ মুঞ্চ বামতাম্।
ক্ষণং জগৎপ্রাণ বিধায় মাধবং
পুরো মম প্রাণহরো ভবিষ্যসি ॥ ৩৯ ॥



মদনের আনন্দ-সখা ওগো বসন্ত-বায়ু,
বৈরিতা ত্যাগ করে একবার তুমি প্রসন্ন হও!
হে জগৎপ্রাণ,
একবার তুমি এনে দাও মাধবকে সম্মুখে আমার,
তারপর তুমি হরণ ক'রে নিও আমার প্রাণ,
কোন দুঃখ নেই তাতে ॥ ৩৯ ॥

রিপুরিব সখীসম্বাসোঽয়ং শিখীব হিমানিলো
বিষমিব সুধারশ্মির্যস্মিন দুনোতি মনোগতে।
হৃদয়মদয়ে তস্মিন্নেবং পুনর্বলতে বলাৎ
কুবলয়সদৃশাং বামঃ কামো নিকামনিরঙ্কুশঃ ॥ ৪০ ॥



যে কৃষ্ণের জন্যে
প্রিয় সখীদের সংসর্গ শত্রুসংসর্গের মত মনে হয়
স্নিগ্ধ বসন্তবায়ুকে মনে হয় আগুনের শিখা,
হায়।
তবু সেই কৃষ্ণের দিকেই ধেয়ে চলে আমার মন।
বুঝলাম,
নারীর প্রেম বুঝি এমনি দুর্বার ॥ 40 ॥

বাধাং বিধেহি মলয়ানিল পঞ্চবাণ
প্রাণান্ গৃহাণ ন গৃহং পুনরাশ্রয়িষ্যে।
কিন্তে কৃতান্তভগিনি ক্ষময়া তরঙ্গৈ-
রঙ্গানি সিঞ্চ মম শাম্যতু দেহদাহঃ ॥ ৪১ ॥



ওগো বসন্তবায়ু,
যত শক্তি তোমার আছে,
ব্যথিত ক'রে তোল আমাকে।
ওগো পঞ্চবাণ,
বিদ্ধ কর এই প্রাণ,
আর ঘরে ফিরে যাব না আমি।
ওগো যমভগিনি,
তুমিই বা কেন ক্ষমা করবে ?
তোমার তরঙ্গরঙ্গে ডুবিয়ে দাও আমাকে,
মরণে স্নিগ্ধ হোক্ দেহের জ্বালা ॥ ৪১ ॥

প্রাতর্নীলনিচোলমচ্যুতমুরঃ সম্বীতপীতাংশুকং
রাধায়াশ্চকিতং বিলোক্য হসতি স্বৈরং সখীমণ্ডলে।
ব্রীড়াচঞ্চলমঞ্চলং নয়নয়োরাধায় রাধাননে
স্মেরস্মেরমুখোঽয়মস্তু জগদানন্দায় নন্দাত্মজঃ ॥ ৪২ ॥



একদিন প্রভাতে,
সহসা সখীরা দেখে,
শ্রীকৃষ্ণের পরিধানে রাধার নীলাম্বর,
আর রাধার বক্ষ ঘিরে শোভা পাচ্ছে কৃষ্ণের
পীতাম্বর,
সখীরা আনন্দে ওঠে হেসে,
তাই শুনে শ্রীহরি কটাক্ষ ইঙ্গিত করেন
রাধিকার লাজনতবদনের দিকে চেয়ে।
নন্দনন্দনের সেই গোপন চাহনি
নিখিলের আনন্দ করুক বর্দ্ধন ॥ ৪২ ॥

চিত্রে জয়দেব
গীতগোবিন্দ



অষ্টম সর্গ
বিলক্ষ লক্ষ্মীপতি

অষ্টম সর্গ

বিলক্ষ লক্ষ্মীপতী

সারা রাত কেটে গেল অপেক্ষায়, প্রিয়তমের অপেক্ষায়। এই কৃষ্ণ আসে, এই কৃষ্ণ আসে, এই চিন্তায় সারারাত্রি জেগে থাকতে হয় শ্রীমতীকে। এই ভাবে রাত ভোর হয়ে গেল। গুরুবেদনায় শ্রীমতীর অন্তর থর থর করে কাঁপতে থাকে। অভিমানে তাঁর চোখ সজল হয়ে ওঠে। এমন সময় প্রভাতে অপরাধীর মতন শ্রীকৃষ্ণ ধীরে এলেন শ্রীমতীর কুঞ্জে, মাথা নত করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। শ্রীকৃষ্ণের দিকে চেয়ে শ্রীমতীর রাগ আর অভিমান শতগুণ বেড়ে উঠলো। দেখেন, অন্য নারীর সঙ্গে কাম-কেলির স্পষ্ট সব নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণের সারা গায়, বেশভূষায়। আলিঙ্গনে, মর্দ্দনে শুকিয়ে গিয়েছে গলার মালা, ঘসে গিয়েছে চোখের কাজল। তাই শ্রীমতী ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, হে কৃষ্ণ, অবলা বধ করবার জন্যেই তুমি জন্মেছ। আজ দেখলাম সেকথা ধ্রুব সত্য। মিনতি আমার, হে নির্লজ্জ, এখান থেকে চলে যাও। এই ভাবে শ্রীমতী যখন ভৎ‍র্সনা করতে আরম্ভ করেন তখন লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ বিলক্ষ হয়ে অর্থাৎ বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকেন শ্রীমতীর দিকে।



অথ কথমপি যামিনীং বিনীয়
স্মরশরজর্জ্জরিতাপি সা প্রভাতে।
অনুনয়বচনং বদন্তমগ্রে
প্রণতমপি প্রিয়মাহ সাভ্যসূয়ম্ ॥ ১ ॥



কোনমতে বহু বেদনায়
রাধা জেগে অতিবাহিত করেন রাত্রি।
প্রভাতে দেখেন,
কুঞ্জদ্বারে শ্রীকৃষ্ণ, অপরাধীর মত প্রণত,
মুখে অনুনয়-বাণী।
মদনের শরে জ্বলে ওঠে রাধার চিত্ত,
কিন্তু সহসা চোখে পড়ে,
কৃষ্ণের অঙ্গে অন্য নারীর রতিচিহ্ন……
দুরন্ত ঈর্ষ্যায় বলেন শ্রীমতী,… ॥ ১ ॥

গীতম্

ভৈরবীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে

রজনিজনিতগুরুজাগররাগকষায়িতমলসনিমেষম্
বহতি নয়নমনুরাগমিব স্ফুটমুদিতরসাভিনিবেশম্ ।
হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্
তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদম্ ॥ ২ ॥



গত রজনীর গুরু জাগরণে
এখনো ঢুলু ঢুলু লাল দু'নয়ন,
স্পষ্ট করছে প্রকাশ অন্য রমণীর প্রতি
তোমার প্রেমের নিষ্ঠা ।
হরি ! হরি ! তুমি যাও !
সরে যাও আমার সম্মুখ হ'তে হে মাধব !
মিছে আর বলো না কপট চাটু কথা ।
যে পারবে তোমার বিষাদ দূর করতে,
ওগো পদ্মলোচন,
তারি করো অনুসরণ ॥ ২ ॥

কজ্জলমলিনবিলোচনচুম্বনবিরচিতন লিমরূপম্‌ ।
দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরনুরূপম্‌ ॥ ৩ ॥

বপুরনুহরতি তব স্মরসঙ্গরখরনখরক্ষতরেখম্‌ ।
মরকতশকলকলিতকলধৌতলিপেরিব রতিজয়লেখম্‌ ॥ ৪ ॥



হে কৃষ্ণ,
গত রাতে যে-প্রেয়সীর সঙ্গে করেছ বিহার,
তার কাজলমাখা নয়নে বারবার চুম্বনে
অমন যে অরুণ রাঙা তোমার অধর,
তোমার নীল অঙ্গের মত তা হয়ে গিয়েছে নীলিম ॥ ৩ ॥

সারা রজনীর প্রেমযুদ্ধে
শ্যামল তোমার অঙ্গে চিহ্নিত হয়ে উঠেছে
সেই·বিজয়িনীর খর-নখ-রেখা,
যেন মরকতফলকে সোণার অক্ষরে হয়েছে লেখা
রতিজয়পত্র ॥ ৪ ॥

চরণকমলগলদলক্তকসিক্তমিদং তব হৃদয়মুদারম্ ।
দর্শয়তীব বহির্মদনদ্রুমনবকিশলয়পরিবারম্ ॥ ৫ ॥

দশনপদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি খেদম্ ।
কথয়তি কথমধুনাপি ময়া সহ তব বপুরেতদভেদম্ ॥ ৬ ॥



উদার তোমার বক্ষে
পড়েছে সেই রমণীর চরণ-কমলের
লাল আল্‌তার দাগ,
(যখন তার চরণ বুকে ধরে সেধেছিলে)
মনে হচ্ছে যেন,
বাইরে ফুটে উঠেছে নব কিশলয়
বিকশিত প্রেমতরুর ॥ ৫ ॥

তোমার অধরে হায়, এখনো লেগে রয়েছে
সেই রমণীর প্রেম-দংশন-চিহ্ন,
ক্ষোভে জ্বলে উঠছে আমার দেহ-মন।
এখনো কি বলবে তুমি
অভিন্ন নয় তোমার আর আমার দেহ ? ॥ ৬ ॥

বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ মনোঽপি ভবিষ্যতিনূনম্ ।
কথমথ বঞ্চয়সে জনমনুগতমসমশরজ্বরদূনম্ ॥ ৭ ॥



হে কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ তোমার দেহ,
তার চেয়ে কৃষ্ণ তোমার মন

নইলে, প্রেমজ্বরে জর্জ্জরিত
চির-অনুগত যে তোমার,
তাকে এমন করে করতে পার বঞ্চনা ? ॥ ৭ ॥

ভ্রমতি ভবানবলাকবলায় বনেষু কিমত্র বিচিত্রম্।
প্রথয়তি পুতনিকৈব বধুবধনির্দ্দয়বালচরিত্রম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতরতিবঞ্চিতখণ্ডিতযুবতিবিলাপম্।
শৃণুত সুধামধুরং বিবুধা বিবুধালয়তোঽপি দুরাপম্ ॥ ৯ ॥



আজ আর ভাবতে লাগে না বিস্ময়,
বনে বনে ঘুরে বেড়াও তুমি
অবলা-বধের আনন্দেই।
বালক কাল থেকেই
তুমি করেছ বধূবধের সাধনা,
পূতনা তার প্রমাণ ॥ ৮ ॥

ওগো সুধীজন,
ঐ শোন প্রেমবঞ্চিতা খণ্ডিতা-যুবতীর
আর্ত্ত বিলাপ,
সুধার চেয়ে মধুর, স্বর্গ-সুদুর্লভ
সেই সঙ্গীত,
গান করে আজ কবি জয়দেব ॥ ৯ ॥

তবেদং পশ্যন্ত্যাঃ প্রসরদনুরাগং বহিরিব
প্রিয়াপাদালক্তস্ফুরিতমরুণচ্ছায়হৃদয়ম্ ।
মমাদ্য প্রখ্যাতপ্রণয়ভরভঙ্গেন কিতব
ত্বদালোকঃ শোকাদপি কিমপি লজ্জাং জনয়তি ॥ ১০ ॥



হে শঠ,
গত রজনী ছিলে যে প্রিয়ার কাছে,
তোমার বক্ষস্থলে আঁকা তার অলক্তক-রাঙা পা
ঘোষণা করছে তোমার অন্তরের গোপন অনুরাগকেই ।
তারি জন্যে যে আজ
ভেঙ্গে পড়লো তোমার আমার চিরন্তন ভালবাসা,
মনে করো না তার জন্যে আমি শোক করছি,
তোমার ব্যবহারে শুধু আমি লজ্জিত হয়ে উঠছি ॥ ১০

অন্তর্মোহনমৌলিঘূর্ণনচলন্মন্দারবিস্রংসন-
স্তব্ধাকর্ষণদৃষ্টিহর্ষণমহামন্ত্র কুরঙ্গীদৃশাম্ ।
দৃপ্যদ্দানবদূয়মানদিবিষদুর্ব্বারদুঃখাপদাং
ভ্রংশঃ কংসরিপোর্ব্যপোহয়তু বঃ শ্রেয়াংসি বংশীরবঃ ॥ ১১ ॥



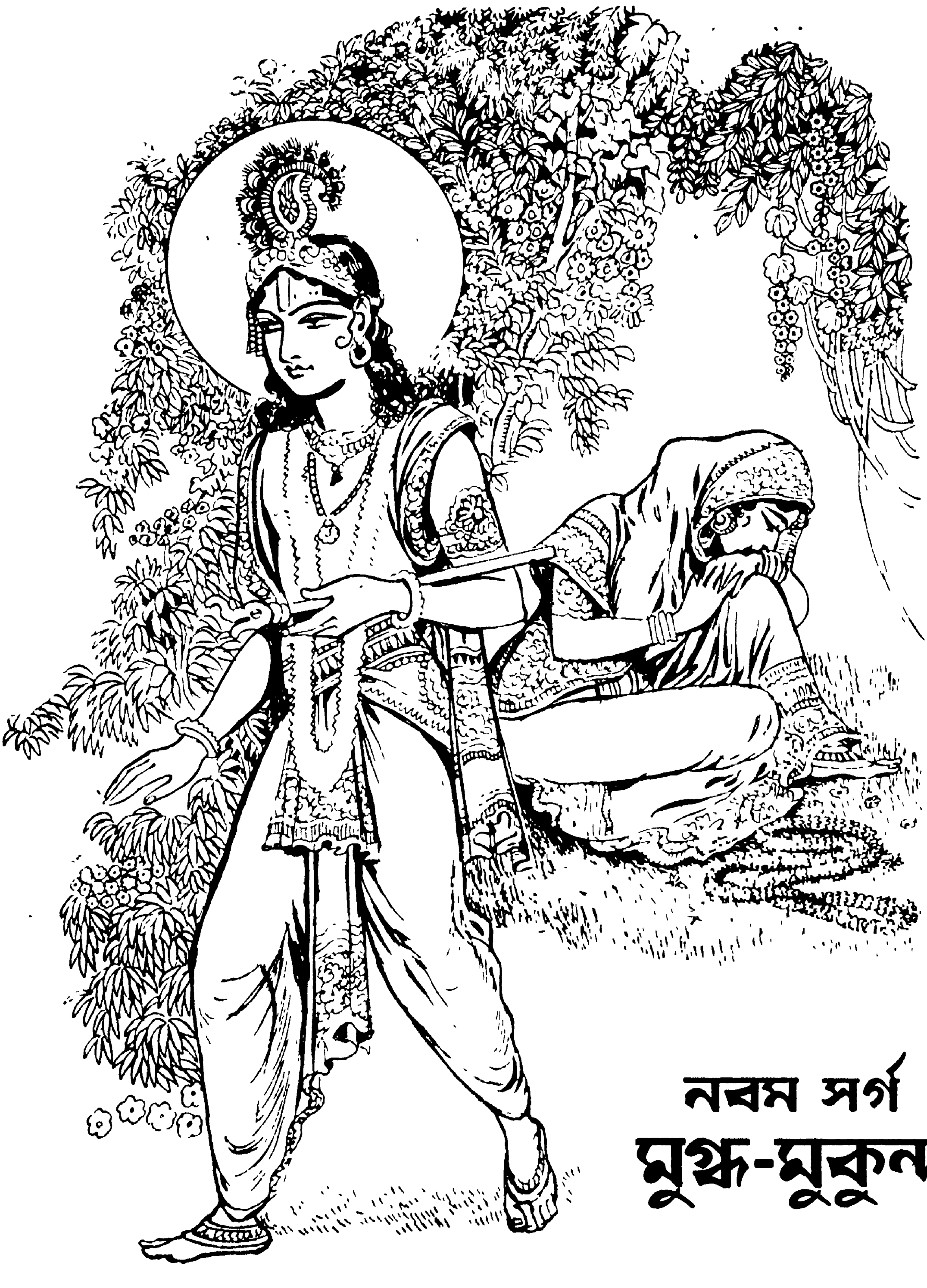
কংসারি শ্রীকৃষ্ণের যে বংশী-ধ্বনি,
মৃগনয়না গোপবধূদের করে সুরমুগ্ধ,
মুগ্ধা-নারীর ঘূর্ণিত শিরে,
এলিয়ে পড়ে কবরী-পাশ,

কবরী থেকে খসে খসে পড়ে মন্দার কুসুম ;
সে বংশী-রব সব কাজের মধ্যে
তাদের করে দেয় স্তব্ধ,
ঘর থেকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে আসে বাইরে,

যে বংশী-রব মহামন্ত্রের মতন
তাদের অন্তর করে পরিচালন,
সেই বংশীরব আবার
দেবতাদের বুকে জাগায় হর্ষ,
সেই বংশীরব তাদের দেয় জানিয়ে
উৎপীড়ক দানবদের ধ্বংস,
কবি জয়দেব করেন প্রার্থনা,
সেই বংশীরবে হোক্ নিখিলের কল্যাণ ॥ ১১



চিত্রে জয়দেব গীতগোবিন্দ



নবম সর্গ

মুগ্ধ-মুকুন্দ

নবম সর্গ

মুগ্ধ-মুকুন্দ

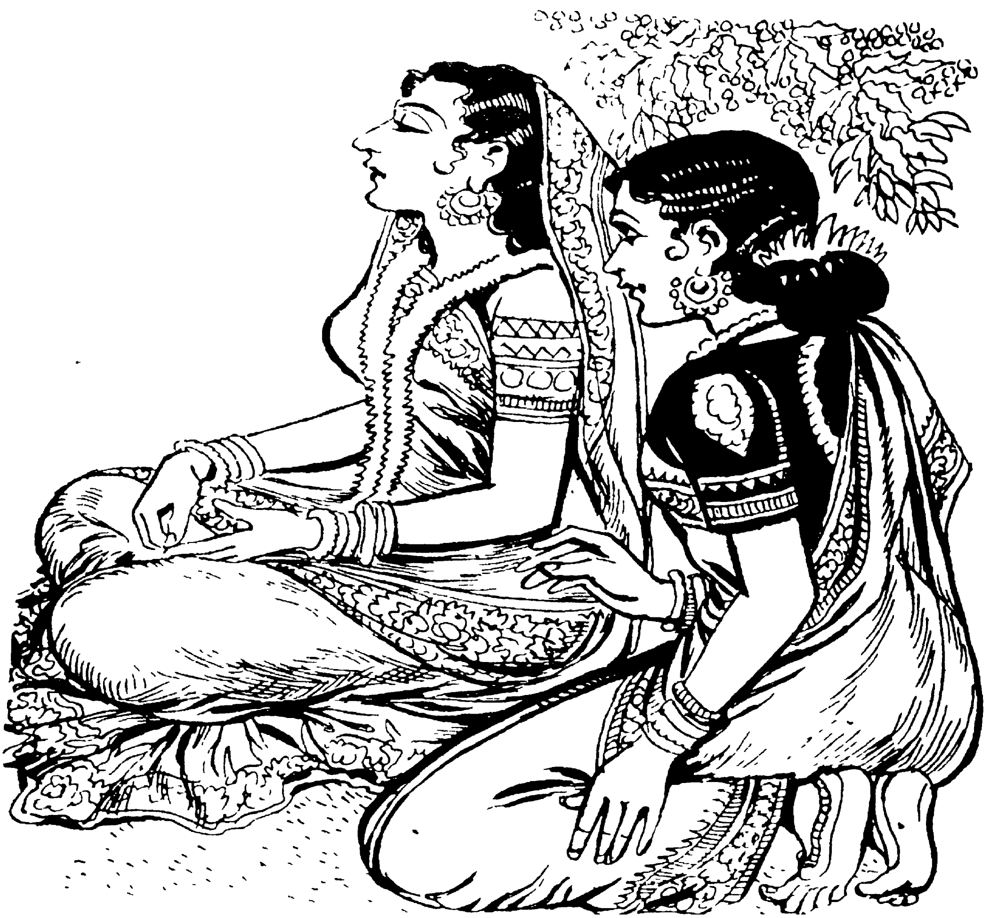
শ্রীমতী অভিমান ভরে শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন ফিরিয়ে। কিন্তু যাকে ফিরিয়ে দিলেন, তারই চিন্তায় বসে থাকেন একাকিনী, সারাক্ষণ মনে মনে তাকেই করেন ধ্যান। এমন সময় এক সখী এসে বেদনাতুরা শ্রীমতীকে ভৎ´সনা করে, এ তুমি কি করলে সখি! অভিমানে মাধবকে দিলে রূঢ়ভাবে ফিরিয়ে? ফিরিয়েই যদি দিলে, তবে এখন আবার বসে কাঁদছো কেন? দেখছো না, তোমার অবস্থা দেখে সখীরা সব হাসছে?

তখন সখীরা শ্রীকৃষ্ণকে ফিরিয়া আনবার চেষ্টা করে। শ্রীমতীকে তারা বুঝিয়ে বলে, শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ফিরিয়ে আনছি, কিন্তু দেখো, আর যেন অভিমান ভরে তাকে দিয়ো না ফিরিয়ে!

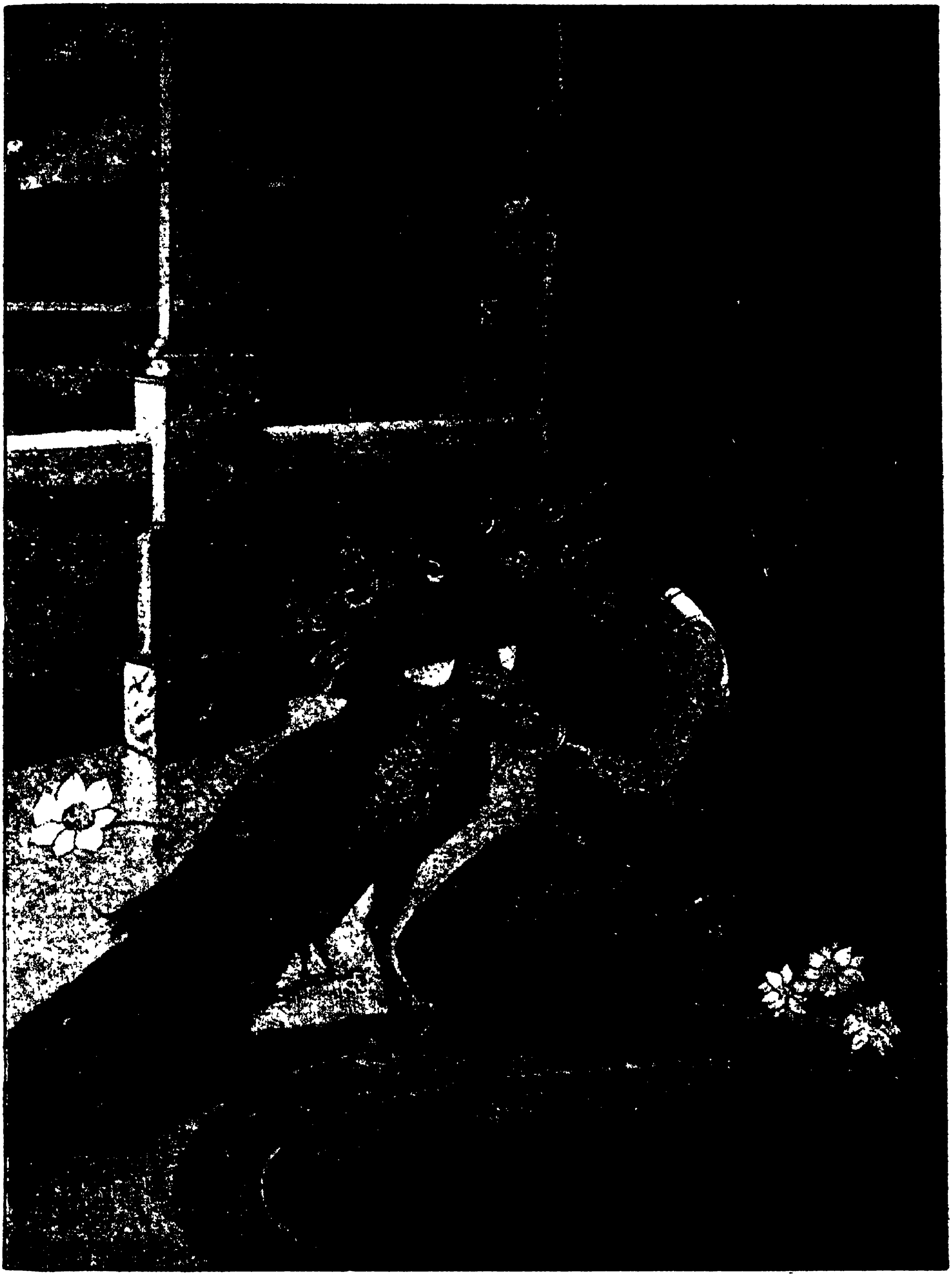
সখীদের মুখে রাধার অনুতাপের কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে যান মাধব। সখীদের অনুসরণ করে তিনি আবার ফিরে চলেন শ্রীমতীর কুঞ্জ ভবনে।



তামথ মন্মথখিন্নাং রতিরসভিন্নাং বিষাদসম্পন্নাম্ ।
অনুচিন্তিত হরিচরিতাং কলহান্তরিতামুবাচ রহঃ সখী ॥ ১ ॥



অভিমানে চলে যান শ্রীহরি ।
শূন্য কুঞ্জভবনে ধ্যান করে শ্রীমতী,
ধ্যান করে আপনার মনে
প্রেম-আহতা রতি-সুখ-বঞ্চিতা কলহান্তরিতা ।
ধ্যান করে তাকেই,
ফিরিয়ে দিল যাকে ।
তাই দেখে এক সখী
শ্রীমতীর কাছে এসে বলে ধীরে,…॥ ১ ॥



মনে পড়ে শ্যাম···শিখী পাখা শিরে

গীতম্‌

রামকিরীরাগযতিতালভ্যাং গীয়তে

হরিরভিসরতি বহতি মৃদুপবনে।
কিমপরমধিকসুখং সখি ভবনে ॥
মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে ॥ ২ ॥

তালফলাদপি গুরুমতিসরসম্‌
কিমু বিফলীকুরুষে কুচকলসম্‌ ॥ ৩ ॥



ওগো মানিনি,
কথা রাখ,
বিমুখ করো না মাধবে মিছা অভিমানে।
ধীরে বইছে পবন,
হরি আসছেন অভিসারে,
এর চেয়ে কি সুখ আছে ভবনে ? ॥ ২ ॥

তালফলের মত গুরুভার
সরস ঐ কুচকলস,
বিফলে কেন যাবে সখি ? ॥ ৩ ॥

কতি ন কথিতমিদমনুপদমচিরম্।
মা পরিহর হরিমতিশয়রুচিরম্ ॥ ৪ ॥

কিমিতি বিষীদসি রোদিষি বিকলা
বিহসতি যুবতিসভা তব সকলা ॥ ৫ ॥

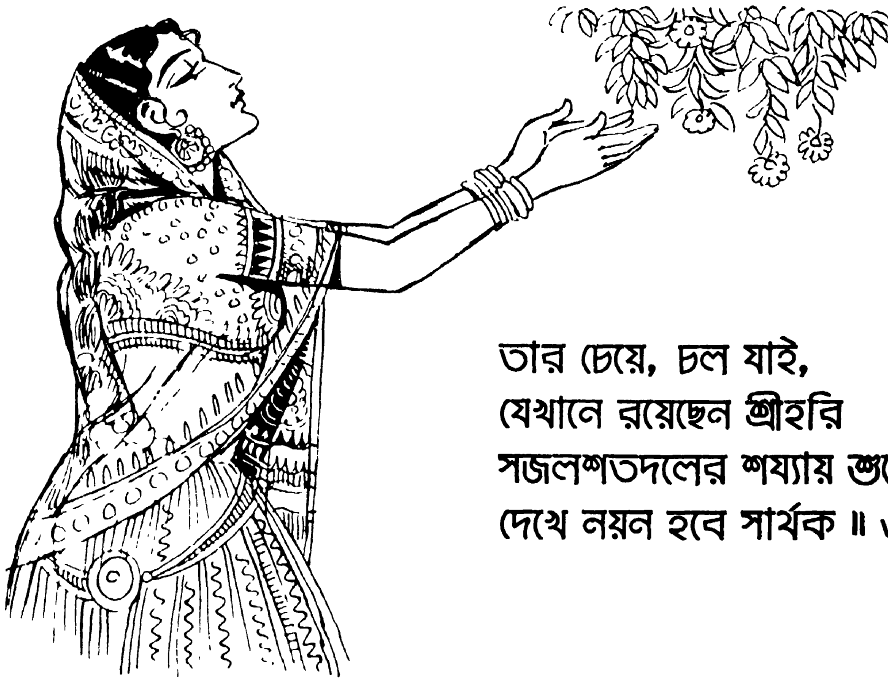


কতদিন কতবার তোমাকে বলেছি, সখি,
চিরসুন্দর সেই শ্রীহরি,
তাঁকে করো না পরিত্যাগ ॥ ৪ ॥

কেন বৃথা দুঃখে আকুল হয়ে
এমন ক'রে কাঁদছো এখন ?
চেয়ে দেখ চারিদিকে
যুবতীরা সব লুকিয়ে হাসছে তোমার দশা দেখে ॥ ৫ ॥

সজলনলিনীদলশীলিতশয়নে
হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে ॥ ৬ ॥

জনয়সি মনসি কিমিতি গুরুখেদম্
শৃণু মম বচনমনীহিতভেদম্ ॥ ৭ ॥



তার চেয়ে, চল যাই,
যেখানে রয়েছেন শ্রীহরি
সজলশতদলের শয্যায় শুয়ে ;
দেখে নয়ন হবে সার্থক ॥ ৬ ॥

গুরুবেদনায় কেন সখি,
অন্তরকে করছো ব্যথিত ?
মন দিয়ে শোন আমার কথা
সব দুঃখ হয়ে যাবে দূর ॥ ৭ ॥

হরিরুপযাতু বদতু বহু মধুরম্ ।
কিমিতি করোষি হৃদয়মতিবিধুরম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমতিললিতম্
সুখয়তু রসিকজনং হরিচরিতম্ ॥ ৯ ॥



আমি বলছি শোন সখি,
শ্রীহরি আপনি এসে
মধুর বচনে করবেন তোমার দুঃখ দূর ।
কেন অকারণে করছো হৃদয়কে
বেদনায় ভারাতুর ? ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেব কবির
এই সুমধুর হরিগুণ-গান,
সুখের প্লাবনে দিক্ ভাসিয়ে
রসিকজনের প্রাণ ॥ ৯ ॥

স্নিগ্ধে যৎ পরুষাসি যৎ প্রণমতি স্তব্ধাসি যদ্রাগিণি
দ্বেষস্থাসি যদুন্মুখে বিমুখতাং যাতাসি তস্মিন্ প্রিয়ে।
তদ্‌যুক্তং বিপরীতকারিণি তব শ্রীখণ্ডচর্চ্চা বিষং
শীতাংশুস্তপনো হিমং হুতবহঃ ক্রীড়ামুদো যাতনাঃ ॥ ১০ ॥



পরুষ হয়ে যে-নারী প্রিয়ভাষীকে দেয় ফিরিয়ে,
চরণে প্রণতের দিকে চায় না ফিরে,
অনুরক্তের প্রতি হয় বিরক্ত,
বিমুখ হয় তারই প্রতি উন্মুখ হয়ে যে তাকেই চায়,
বিপরীত-রীতি সে-নারীর কাছে
চন্দনের প্রলেপ হবে বিষ-জ্বালা,
চাঁদের কিরণ এনে দেবে সূর্য্যের তাপ,
রতি-রঙ্গ হবে যাতনার ভার,
তাতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে ? ॥ ১০ ॥

সান্দ্রানন্দপুরন্দরাদিদিবিষদ্বৃন্দৈরমন্দাদরা-
দানম্রৈর্মুকুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দর্শিতেন্দিবরম্।
স্বচ্ছন্দং মকরন্দসুন্দরগলন্মন্দাকিনীমেদুরং
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমশুভস্কন্দায় বন্দামহে ॥ ১১ ॥



আনন্দে যে-চরণে প্রণাম করে
পুরন্দর-আদি দেবতারা,
প্রণত দেবতার মাথার মুকুটের ইন্দ্রনীলমণি
নীলপদ্মে ভ্রমরের মত পায় শোভা যে-চরণে,
বিগলিত-মকরন্দ-সুন্দর মন্দাকিনীর স্বচ্ছন্দ ধারায়
স্নিগ্ধ শীতল যে-চরণ,
বন্দনা করি গোবিন্দের সেই চরণারবিন্দ,
দূর হোক্ নিখিলের নিরানন্দের ভার ॥ ১১ ॥

চিত্রে জয়দেব গীতগোবিন্দ



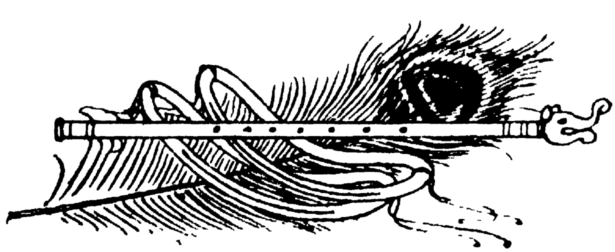
দশম সর্গ

মুগ্ধ মাধব

দশম সর্গ

মুগ্ধ মাধব

সখীরা শ্রীমতীকে ভৎ´সনা করছিলেন, কেন তুমি নিষ্ঠুরার মতন অভিমানে ক্ষিপ্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দিলে ফিরিয়ে? সখীদের কথায় শ্রীমতীর অভিমান আর ক্রোধ ধীরে ধীরে ক্রমশঃ শান্ত হয়ে আসছিল। কুঞ্জ-ভবনে সন্ধ্যার ছায়াও ধীরে ধীরে নেমে আসছিল। শ্রীমতীর মনে কৃষ্ণবিরহের ব্যথা নিবিড়তর হয়ে উঠছিল। এমন সময় কুঞ্জের বাইরে শুক্‌নো পাতার উপর মৃদু চরণের ধ্বনি জেগে উঠল। বাতাস সুরভিত হয়ে উঠল চন্দন গন্ধে। কম্পিত অন্তরে শ্রীমতী চেয়ে দেখেন সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ। এইভাবে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে আসতে দেখে শ্রীমতীর অন্তর সংগোপনে আনন্দে কেঁপে উঠল, সলজ্জভাবে তিনি সখীদের দিকে চাইলেন। সখীরা সে চাউনির অর্থ বুঝতে পেরে নীরবে সেখান থেকে সরে পড়লেন। এই অবকাশে মুগ্ধ মাধব নতজানু হয়ে শ্রীমতীকে আহ্বান করে বললেন "দেহি পদপল্লব-মুদারম্।"



অত্রান্তরে মসৃণরোষবশামসীম-
নিঃশ্বাসনিঃসহমুখীং সুমুখীমুপেত্য।
সব্রীড়মীক্ষিতসখীবদনাং প্রদোষে
সানন্দগদ্গদপদং হরিরিত্যুবাচ ॥ ১ ॥



ক্রমে ঘনিয়ে আসে সন্ধ্যা—ধীরে প্রশমিত হয়ে আসে
বিষণ্ণবদনা রাধার ক্রোধের উগ্রতা।
কৃষ্ণ-অদর্শনে ঘন ঘন বইতে থাকে দীর্ঘশ্বাস।
এমন সময় সহসা শ্রীমতী দেখেন
সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীহরি।
লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে শ্রীমতীর মুখ,
চেয়ে থাকেন সখীদের দিকে।
রাধার সেই ভাবান্তর দেখে
আনন্দে গদগদকণ্ঠে বলেন মাধব···॥ ১ ॥

গীতম্

দেশবরাড়ীরাগাষ্টতালাভ্যাং গীয়তে

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্ ।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রম্ ।
রোচয়তি লোচন-চকোরম্ ॥ ২ ॥



প্রিয়ে,
প্রেমভরে একবার শুধু বল একটী কথা,
তোমার শুভ্র-দশনের জ্যোৎস্নাছটায়
দূর হয়ে যাক্ অন্তরের এই আঁধার ঘোর ।
তোমার মুখ-চন্দ্রের আকর্ষণে
উচ্ছল হয়ে উঠেছে তোমার অধরের সুধা,—
ওগো প্রিয়ে,
চকোরের মত আমার নয়ন
পিপাসার্ত চেয়ে আছে সেই অধরের দিকে ॥ ২ ॥

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসম্
দেহি মুখকমলমধুপানম্ ॥ ৩ ॥



প্রিয়ে চারুশীলে,
দূর কর এই অকারণ মান।
তোমার বিমুখ মানে
বিরহজ্বালায় জ্বলে যায় আমার চিত্ত।
ওগো প্রিয়ে,
তোমার ঐ মুখকমলের মধুদানে
স্নিগ্ধ কর সে-তীব্র-দহনজ্বালা ॥ ৩ ॥

সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খরনয়নশরঘাতম্‌ ।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনম্‌
যেন বা ভবতি সুখজাতম্‌ ॥ ৪ ॥



ওগো প্রিয়ে,
যদি সত্যই আমার ওপর হয়ে থাক ক্রুদ্ধ,
তবে ঐ তো রয়েছে তোমার তীব্র নয়নকটাক্ষ,
আমাকে কর বিদ্ধ তাতে ;
ঐ ভুজলতার পাশে আমাকে কর বন্দী,
দংশন কর চুম্বনে চুম্বনে,
দাও আমাকে শাস্তি,
যাতে তুমি পাও সুখ ॥ ৪ ॥

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্ ।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্ ॥ ৫ ॥



ওগো প্রিয়ে,
তুমিই আমার ভূষণ,
আমার জীবনের জীবন ।
ভব-জলধির তুমিই রত্ন ।
হৃদয়ের শুধু একটি কামনা,
তুমি থাক সেখানে চির-প্রীতিতে বাঁধা ॥ ৫ ॥

নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনম্
ধারয়তি কোকনদরূপম্ ।
কুসুম-শর-বাণ-ভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্ ॥ ৬ ॥



ওগো তন্বি,
নীলাভ তোমার নয়ন-কমল
রাগে হয়েছে রক্তকমলের মত লাল ;
ঐ নয়নের প্রেম-দৃষ্টি
যদি পারে আমার কৃষ্ণদেহকে করতে অনুরঞ্জিত,
তবে জানবো সার্থক হয়েছে তার রূপান্তর ॥ ৬ ॥

স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মণিমঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্ ।
রসতু রসনাপি তব ঘনজঘনমণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম্ ॥ ৭ ॥



ওগো প্রিয়ে,
কুচ-কুম্ভের ওপর দুলছে যে মণি-হার,
রতি-উল্লাসে ঝিকমিক করে উঠুক তার দীপ্তি,
আলোকিত হয়ে উঠুক তোমার বক্ষ ;
তোমার সঘন-জঘনে রয়েছে যে মেখলা
মুখরিত হয়ে উঠুক তা রতি-রঙ্গে,
ঘোষণা করুক মন্মথের জয়বার্ত্তা ॥ ৭ ॥

স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনম্
জনিত-রতি-রঙ্গ-পরভাগম্ ।
ভণ মসৃণ-বাণি করবাণি চরণদ্বয়ং
সরস-লসদলক্তকরাগম্ ॥ ৮ ॥



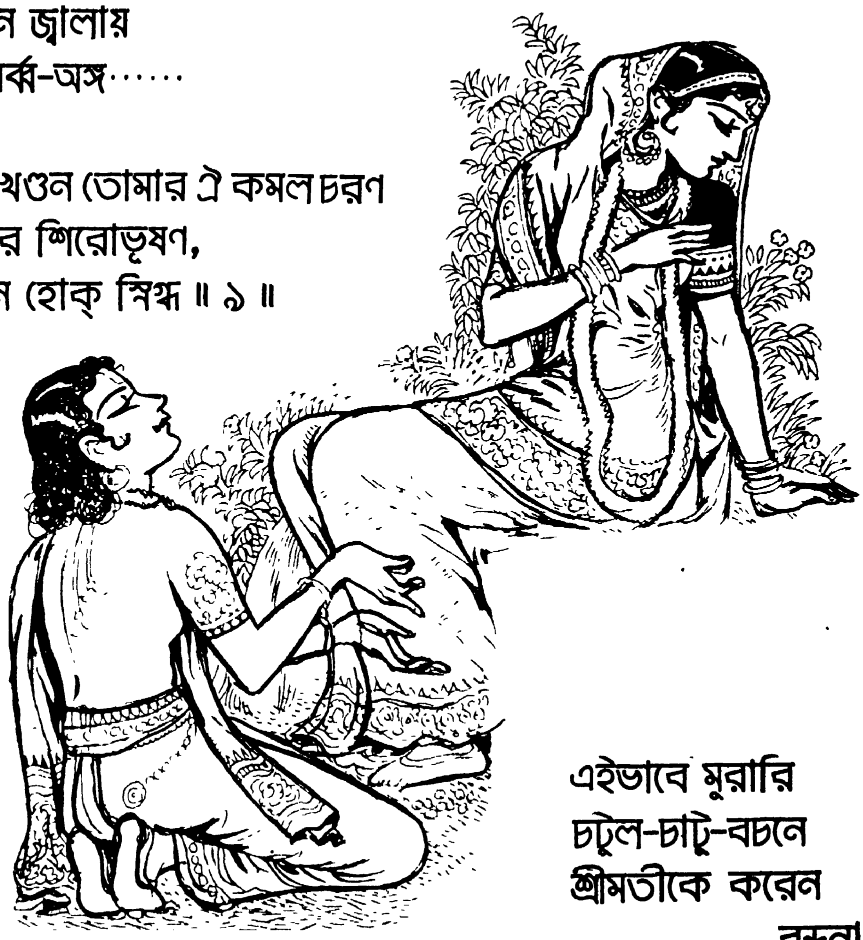
স্থলকমল-গঞ্জন
আমার হৃদয়-রঞ্জন,
রতিরঙ্গে সুশোভন তোমার ঐ রক্ত-চরণ,
ওগো প্রিয়ে, কর আদেশ
সরস অলক্তকরাগে করি রঞ্জিত ॥ ৮ ॥

[দুইশ']

স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদপল্লবমুদারম্ ।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিতবিকারম্ ॥ ৯ ॥

ইতি চটুল-চাটু-পটু-চারু মুরবৈরিণো
রাধিকামধি বচনজাতম্ ।
জয়তি পদ্মাবতী-রমণ-জয়দেবকবি-
ভারতী-ভণিতমতিশাতম্ ॥ ১০ ॥

মদনের দহন জ্বালায়
জ্বলে যায় সর্ব্ব-অঙ্গ……
ওগো প্রিয়ে,
স্মর-গরল-খণ্ডন তোমার ঐ কমল চরণ
হোক্ আমার শিরোভূষণ,
দগ্ধ তনু-মন হোক্ স্নিগ্ধ ॥ ৯ ॥



এইভাবে মুরারি
চটুল-চাটু-বচনে
শ্রীমতীকে করেন
বন্দনা,

তারই সঙ্গীত রচনা করে
পদ্মাবতী-রমণ কবি জয়দেব ॥ ১০ ॥

পরিহর কৃতাতঙ্কে শঙ্কাং ত্বয়া সততং ঘন-
স্তনজঘনয়াক্রান্তে স্বান্তে পরানবকাশিনি।
বিশতি বিতনোরন্যো ধন্যো ন কোঽপি মমান্তরং
প্রণয়িনি পরীরম্ভারম্ভে বিধেহি বিধেয়তাম্ ॥ ১১ ॥



ওগো ভীরু,
অন্য-নায়িকাসক্ত মনে ক'রে
আমি জানি তুমি ভীত হয়ে উঠেছ,
দূর কর প্রিয়ে সে-ভয়।
তোমার ঘন-জঘন-বিস্তারে
তুমি চিরবন্দী ক'রে রেখেছ আমাকে।
মাধবের অন্তরে একমাত্র তুমিই অন্তরবাসিনী
সেখানে অন্য কারুর স্থান আর কোথায় ?
একমাত্র কামদেব ছাড়া,
আমার অন্তরে প্রবেশ করে
এমন কে আছে আর ত্রিভুবনে ?
তাই বলি প্রিয়ে,
অনুমতি দাও আলিঙ্গনের ॥ ১১ ॥

মুগ্ধে বিধেহি ময়ি নির্দয়দন্তদংশ-
দোর্বল্লিবন্ধ-নিবিড়-স্তনপীড়নানি।
চণ্ডি ত্বমেব মুদমঞ্চ ন পঞ্চবাণ
চণ্ডালকাণ্ড-দলনাদসবঃ প্রয়ান্তু ॥ ১২ ॥



অয়ি মুগ্ধে,
শাস্তি যদি দিতে হয়, তুমি নিজে দাও সে-শাস্তি……
বাহু দিয়ে কর বন্ধন আমাকে,
দংশন কর দশন দিয়ে,
পীড়ন কর ঐ নিবিড় স্তনভারে ;
দোহাই তোমার, হে চণ্ডি,
দেখো যেন ঐ চণ্ডাল মদনের শাস্তিতে প্রাণ না যায় ॥ ১২ ॥

শশিমুখি তব ভাতি ভঙ্গুর-ভ্রূ-
যুবজনমোহ-করাল-কালসর্পী ।
তদুদিত-ভয়ভঞ্জনায় যূনাম্
ত্বদধর-সীধু-সুধৈব সিদ্ধমন্ত্র ॥ ১৩ ॥



চন্দ্রাননে,
তোমার ঐ ভঙ্গুর ভ্রূ
বেঁকে উঠেছে যেন করাল কাল-সাপিনী,
ভয়ে মোহে কেঁপে ওঠে তরুণ মন—
সে-আশঙ্কা দূর করবার সিদ্ধমন্ত্র
কিন্তু সঞ্চয় ক'রে রেখেছ তোমারই অধরসুধায় ॥ ১৩

ব্যথয়তি বৃথা মৌনং তন্বি প্রপঞ্চয় পঞ্চমং
তরুণি মধুরালাপৈস্তাপং বিনোদয় দৃষ্টিভিঃ।
সুমুখি বিমুখীভাবং তাবদ্বিমুঞ্চ ন মুঞ্চমাং
স্বয়মতিশয়-স্নিগ্ধো মুগ্ধে প্রিয়োঽয়মুপস্থিতঃ ॥ ১৪ ॥



ওগো তন্বি,
অকারণ মৌনতায়
ব্যথিত চিত্তকে আর করো না বিড়ম্বিত।
মধুর আলাপে আর নয়নের মধু-দৃষ্টিতে
দূর কর সে-ব্যথা।
ত্যাগ কর এই বিমুখভাব,
ত্যাগ করো না তাকে
প্রণয়-মুগ্ধ আপনা থেকে যে এসে দাঁড়িয়েছে
তোমার সামনে ॥ ১৪ ॥

বন্ধূকদ্যুতিবান্ধবোঽয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধুকচ্ছবি-
গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনম্।
নাসাভ্যেতি তিলপ্রসূন-পদবীং কুন্দাভদন্তি প্রিয়ে
প্রায়স্ত্বন্মুখসেবয়া বিজয়তে বিশ্বং স পুষ্পায়ুধঃ ॥ ১৫ ॥



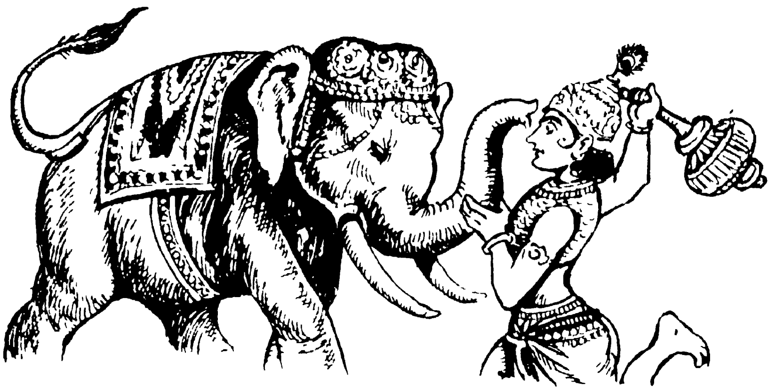
বন্ধূক ফুলের মত রক্তবর্ণ তোমার অধর,
কপোল মধুককুসুমের মত স্নিগ্ধ,
নয়ন তোমার নীলপদ্ম,
তিলফুলের মত নাসা,
দন্ত তোমার কুন্দ ফুলের মত শুভ্র।
তোমার আননেই রয়েছে মদনের পঞ্চ পুষ্পবাণ।
মনে হয়, তোমার ঐ বদনের প্রসাদেই
মদন করেছে বিশ্বজয় ॥ ১৫ ॥

দৃশোতব মদালসে বদনমিন্দুসন্দীপনম্
গতির্জ্জনমনোরমা বিজিতরম্ভমুরুদ্বয়ম্ ।
রতিস্তব কলাবতী রুচিরচিত্রলেখে ভ্রুবা-
বহো বিবুধ-যৌবতং বহসি তন্বি পৃথ্বীগতা ॥ ১৬ ॥



দৃষ্টি তোমার মদালসা,
আনন তোমার চন্দ্রসমান,
গতিভঙ্গী তোমার নিখিলের মনোহারী,
রম্ভার গঠনকে লজ্জা দেয় তোমার স্নিগ্ধ উরু,
তোমার রতি-ক্রীড়া ললিতকলার চরম নিদর্শন,
তোমার ভ্রু-তে আঁকা নিপুণ চিত্রলেখা ।
ওগো তন্বি,
পৃথিবীর মানবী হয়েও,
স্বর্গ-দেবীদেরও তুমি আশ্রয় ॥ ১৬ ॥

প্রীতিং বস্তনুতাং হরিঃ কুবলয়াপীড়েন সার্দ্ধং রণে
রাধাপীনপয়োধরস্মরণকৃৎকুম্ভেন সম্ভেদবান্।
যত্র স্বিদ্যতি মীলতি ক্ষণমথ ক্ষিপ্তে দ্বিপে তৎক্ষণাৎ
কংসস্যালমভূজ্জিতং জিতমিতি ব্যামোহকোলাহলঃ ॥ ১৭ ॥



কংসের হস্তী কুবলয়াপীড়ের সঙ্গে যুদ্ধে
তার কুম্ভসম্ভেদ করতে গিয়ে,
নিমেষের মধ্যে শ্রীহরির স্মরণে উদিত হলো
শ্রীমতীর পীনপয়োধর।
তখন সর্ব্বশরীর তাঁর স্বেদসিক্ত হয়ে উঠলো,
আবেশে মুদলেন দুই চোখ।
কংসের অনুচরেরা শ্রীহরিকে পরাজিত মনে করে
জয়ধ্বনি করে উঠলো।
কিন্তু সেই জয়ধ্বনি শোনার সঙ্গে সঙ্গে
প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলেন শ্রীহরি,
নিমেষে হস্তীকে বধ করে দিলেন দূরে ফেলে,—
কংস-অনুচরেরা শোকে কোলাহল করে উঠলো আবার।
সেই কংসারি শ্রীহরি, করুন আপনাদের
আনন্দ বর্দ্ধন ॥ ১৭ ॥



আজ কে গো মুরলী বাজায়

একাদশ সর্গ

সানন্দ-গোবিন্দ

শ্রীমতীর দুর্জ্জয় মানকে ভাঙবার জন্যে শ্রীকৃষ্ণের যত আকুতি, যত মিনতি, এই সর্গে আমরা দেখলাম, তা সার্থক হলো। সখীদের প্রাণান্ত চেষ্টায়, শ্রীকৃষ্ণের চটুল চাটু বচনে শ্রীমতীর মান ভাঙলো। সমস্ত বিশ্ব যাকে চায় সে নিজে নতজানু হয়ে বল্লো, দেহি পদপল্লবমুদারম্‌···অভিমানিনী শ্রীমতীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লেন মাধব। শ্রীমতীর বিষণ্ণ মুখের ওপর জমে উঠেছিল যে অকরুণ মেঘের ছায়া, দূরে উড়ে গেল তা। আবার হেসে উঠলো শ্রীমতীর কমল-আনন। সখীদের ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণ অভিসার-বেশে কুঞ্জ-শয্যায় শ্রীমতীর অপেক্ষায় রইলেন। কবি জয়দেব সখীদের হাত ধরে শ্রীমতীকে পৌঁছে দিয়ে এলেন মিলন-শয্যার কাছে। আনন্দে উথলে উঠলো গোবিন্দের অন্তর মিলন-সুখের স্পন্দনে।



চিত্রে জয়দেব
গীতগোবিন্দ



একাদশ সর্গ
সানন্দ-গোবিন্দ

সুচিরমনুনয়েন প্রীণয়ত্বা মৃগাক্ষীম্
গতবতি কৃতবেশে কেশবে কুঞ্জশয্যাম্ ।
রচিতরুচিরভূষাং দৃষ্টিমোষে প্রদোষে
স্ফুরতি নিরবসাদাং কাপি রাধাং জগাদ ॥ ১ ॥



বহুক্ষণ ধরে এইভাবে মিনতি জানিয়ে
মৃগাক্ষীকে প্রসন্না করেন শ্রীহরি।
তারপর, প্রদোষের ঘন-অন্ধকারে
নিশি-অভিসারের বেশে
উপস্থিত হন কুঞ্জভবনে।
রুচির সাজে সজ্জিতা শ্রীমতী তখন
ভুলে গিয়েছেন সব অবসাদ, সব বিষাদ।
তাই সখী ডেকে বলে উৎফুল্লা শ্রীমতীকে ॥ ১ ॥

[ছন্দ' এগার]

গীতম্

বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে

বিরচিতচাটুবচনরচনং চরণে রচিত-প্রণিপাতম্
সম্প্রতি মঞ্জুলবঞ্জুলসীমনি কেলিশয়নমনুযাতম্ ।
মুগ্ধে মধু-মথনমনুগতমনুসর রাধিকে ॥ ২ ॥



ওগো সখি,
কত না চাটু বচনে তোমার চরণ ধ'রে
যে-মাধব ভাঙ্গলো তোমার মান,
সে এখন অপেক্ষা ক'রে আছে তোমার জন্যে
কুঞ্জভবনের কেলিশয্যায়।
তাই বলি, ওগো মুগ্ধে,
ওঠ, অনুসরণ কর মাধবকে ॥ ২ ॥

ঘনজঘনস্তনভারভরে দরমন্থরচরণবিহারম্‌।
মুখরিতমণিমঞ্জীরমুপৈহি বিধেহি মরালনিকারম্‌॥ ৩॥

শৃণু রমণীয়তরং তরুণীজনমোহনমধুরিপুরাবম্‌।
কুসুমশরাসনশাসনবন্দিনি পিকনিকরে ভজ ভাবম্‌॥ ৪॥



ঘনজঘনে আর স্তনভারে মন্থর তোমার চরণে
বেজে উঠুক মণিময় নূপুর।
মরালের মত গতিতে ধীরে
ওগো মুগ্ধে, অনুসরণ কর তোমার মাধবকে॥ ৩॥

কোকিল ডাকছে,—ডেকে বলছে,
ওগো মানিনি, পরিত্যাগ ক'র মান
যুবতীমনোহরণ মধুরিপু মাধবের শোন কথা ;
এই বার্ত্তাই ঘোষণা করছে,
কামদেবের স্তাবক কোকিলেরা
অতএব রাগ করো না তাদের ওপর॥ ৪॥

অনিলতরলকিশলয়নিকরেণ করেণ লতানিকুরম্বম্।
প্রেরণমিব করভোরু করোতি গতিং প্রতি মুঞ্চ বিলম্বম্ ॥ ৫ ॥

স্ফুরিতমনঙ্গতরঙ্গবশাদিব সূচিতহরি পরিরম্ভম্।
পৃচ্ছ মনোহরহারবিমলজলধারমমুং কুচকুম্ভম্ ॥ ৬ ॥



হে করভোরু,
ঐ দেখ বায়ুতাড়িত লতারা
করপল্লবে তোমাকে ইঙ্গিত করছে অভিসারে,
অতএব আর বিলম্ব করো না গমনে ॥ ৫ ॥

আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়,
জলধারের মতন মনোহরহার-শোভিত
তোমার ঐ কুচকুম্ভকেই জিজ্ঞাসা কর,
প্রেমের তরঙ্গবেগে কাঁপছে তোমার বক্ষঃস্থল,
ঘন উদ্বেগে কামনা করছে শ্রীহরির আলিঙ্গন ॥ ৬ ॥

আধগতমখিলসখীভিরিদং তব বপুরপি রতিরণসজ্জম্।
চণ্ডি রণিত-রসনা-রব-ডিণ্ডিমমভিসর সরসমলজ্জম্ ॥ ৭ ॥



আমরা সখীরা সবাই জানি,
রতিরণের সজ্জায় সেজেছে তোমার দেহ।
তাই ওগো প্রেমরণপণ্ডিতা,
দূর ক'রে লজ্জা, কর অভিসার-যাত্রা
সগৌরবে মেখলায় বাজুক প্রেম-রণ-বাদ্য ॥ ৭.

[দুশ' পনের]

স্মর-শর-সুভগ-নখেন করেণ সখীমবলম্ব্য সলীলম্।
চল বলয়কণিতৈরববোধয় হরিমপি নিজগতিশীলম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমধরীকৃতহারমুদাসিতবামম্।
হরিবিনিহিত মনসামধিতিষ্ঠতু কণ্ঠতটীমবিরামম্ ॥ ৯ ॥



কামশরের মতন নখশোভিত করে
অবলম্বন কর সখীকে,
লীলায়িত ভঙ্গিমায় এগিয়ে চল কুঞ্জভবনে,
বলয়ের নিক্কণে ঘোষণা কর আগমন-বার্তা
আহ্বান কর শ্রীহরিকে প্রেম-রণে ॥ ৮ ॥

কণ্ঠহারের চেয়ে সুন্দর, রমণীর চেয়ে রমণীয়
কবি জয়দেবের এই কৃষ্ণ-সঙ্গীত,
কৃষ্ণগতপ্রাণ ভক্তদের কণ্ঠে অবিরাম থাকুক লগ্ন ॥ ৯ ॥

স মাং দ্রক্ষ্যতি বক্ষ্যতি স্মরকথাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গনৈঃ
প্রীতিং যাস্যতি রংস্যতে সখি সমাগত্যেতি সঞ্চিন্তয়ন্।
স ত্বাং পশ্যতি বেপতে পুলকয়ত্যানন্দতি স্বিদ্যতি
প্রত্যুদ্গচ্ছতি মূর্চ্ছতি স্থিরতমঃপুঞ্জে নিকুঞ্জে প্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥



ঘন-অন্ধকারে নিকুঞ্জভবনে
শ্রীহরি রয়েছেন তোমার অপেক্ষায়,
ক্ষণে ক্ষণে ভাবছেন যেন তুমি এসে দাঁড়িয়েছ সামনে,
সেই আনন্দের পুলকে হয়ে উঠছেন ঘর্মাক্ত ;
কখন বা মনে মনে করছেন আশা,
তুমি আসবে, মধুর আলাপে আর আলিঙ্গনে
নন্দিত ক'রে তুলবে তাঁর চিত্ত ;
কখনো বা তুমি আসছো মনে ক'রে
এগিয়ে আসছেন তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে
যাবার জন্যে,
তোমাকে না দেখে আবার শোকে মূৰ্চ্ছিত হয়ে
পড়ছেন ॥ ১০ ॥

অক্ষ্ণোর্নিক্ষিপদঞ্জনং শ্রবণয়োস্তাপিঞ্ছগুচ্ছাবলীং
মূর্দ্ধি, শ্যামসরোজদামকুচয়োঃ কস্তুরিকাপত্রকম্।
ধূর্ত্তানামভিসারসত্বরহৃদাং বিষ্বঙ্ নিকুঞ্জে সখি
ধ্বান্তং নীলনিচোলচারু সুদৃশাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গতি ॥ ১১ ॥



নয়নে কালো অঞ্জন,
কর্ণে তমাল-গুচ্ছ,
মাথায় নীলোৎপল মালা,
স্তনে মৃগমদপত্র, পরিধানে নীলাম্বর,
চতুরা অভিসারিকা কম্পিতহৃদয়ে
এইভাবে বেশভূষায় সজ্জিতা হয়ে যখন যায়
অভিসারে,
মনে হয়,
যেন অন্ধকারও চলেছে তাদের অঙ্গ ঘিরে ॥ ১১ ॥

কাশ্মীর-গৌর-বপুষামভিসারিকাণা-
মাবদ্ধরেখমভিতো রুচিমঞ্জরীভিঃ।
এতত্তমালদল-নীলতমং তমিস্রং
তৎপ্রেমহেমনিকষোপলতাং তনোতি ॥ ১২ ॥



ঘন আঁধারের পটভূমিকায়
বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে
কুঙ্কুমবর্ণা অভিসারিকাদের গৌর-দেহের জ্যোতি,—
তমালপাতার মত সেই ঘননীল অন্ধকার
যেন অভিসারিকার প্রেমের নিকষ-পাষাণ;
নিকষ-পাষাণে যেমন উজ্জ্বলতর হয়ে উঠে স্বর্ণ
তেমনি সেই ঘন অন্ধকারে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে
তাদের প্রেম ॥ ১২ ॥

হারাবলীতরলকাঞ্চনকাঞ্চিদাম-
মঞ্জীরকঙ্কণমণিদ্যুতিদীপিতস্য ।
দ্বারে নিকুঞ্জনিলয়স্য হরিং বিলোক্য
ব্রীড়াবতীমথ সখীমিয়মিত্যুবাচ ॥ ১৩ ॥



(শ্রীমতী এসে উপস্থিত হ'লেন কুঞ্জভবনে)
তখন শ্রীমতীর অঙ্গের মণিহার থেকে,
স্বর্ণমেখলা, মঞ্জীর আর মণিকঙ্কণ থেকে
বিচ্ছুরিত হয়ে পড়লো যে আলো,
সে-আলোয় শ্রীমতী দেখলেন দাঁড়িয়ে রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ ।
লজ্জায় নত হয়ে গেল শ্রীমতীর মুখ ।
তাই দেখে সখী বলে,···॥ ১৩ ॥

গীতম্

দেশবাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে

মঞ্জুতরকুঞ্জতলকেলিসদনে
বিলস রতি-রভসহসিতবদনে।
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ ॥ ১৪ ॥

নবভবদশোকদলশয়নসারে।
বিলস কুচকলসতরলহারে ॥ ১৫ ॥



হে রাধে, আনন্দে প্রবেশ কর
মঞ্জু কুঞ্জভবনে।
হসিত বদনে
গিয়ে দাঁড়াও মাধবের পাশে,
আনন্দে রত হও রতি-রঙ্গে ॥ ১৪ ॥

ওগো সখি,
নবীন অশোকপল্লবে রচিত হয়েছে প্রেমশয্যা,
হারতরঙ্গিতবক্ষে গ্রহণ কর সে-শয্যা,
আনন্দে রত হও রতি-বিলাসে ॥ ১৫ ॥

কুসুমচয়রচিতশুচিবাসগেহে।
বিলস কুসুমসুকুমারদেহে ॥ ১৬ ॥

চলমলয়বনপবনসুরভিশীতে।
বিলস রতিবলিতললিতগীতে ॥ ১৭ ॥

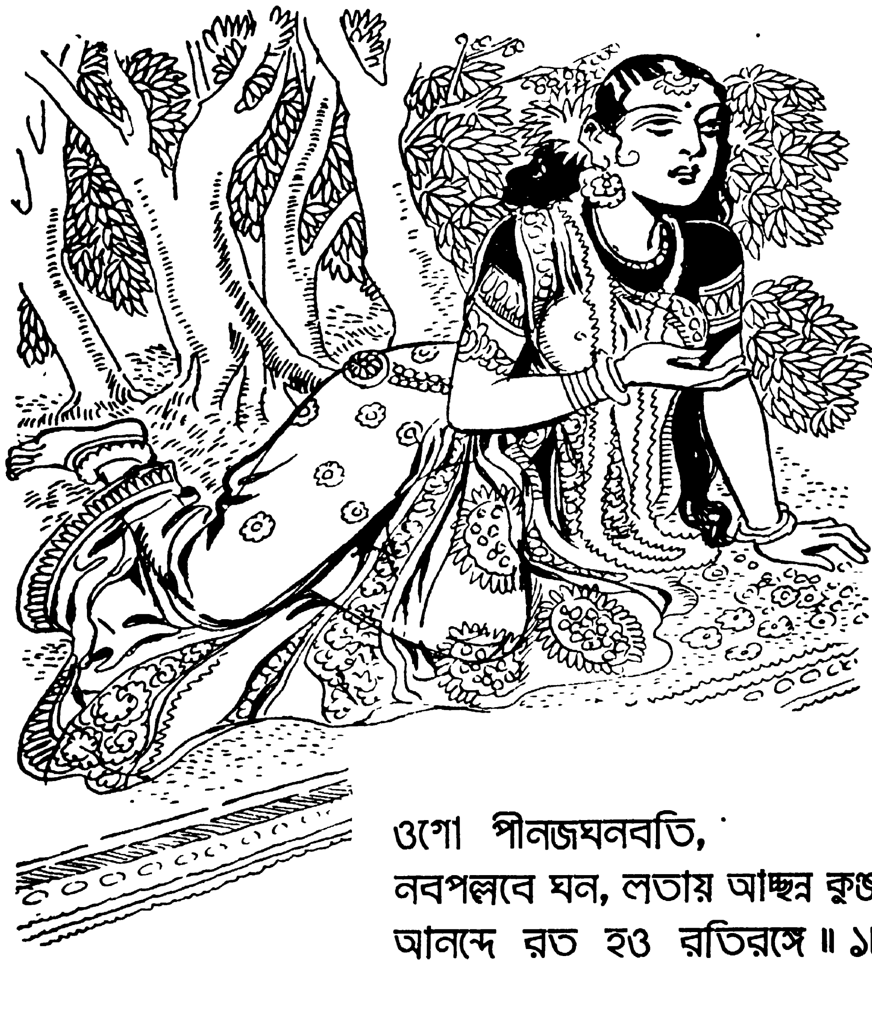


হে কুসুমকোমলাঙ্গী,
কুসুমে রচিত ঐ শুচি বাসকশয়নে
আনন্দে রত হও রতিরঙ্গে ॥ ১৬ ॥

মলয়পবনে স্নিগ্ধশীতল কুঞ্জভবনে
সঙ্গীতমুখরিত ললিতস্পন্দনে
আনন্দে রত হও সখি রতি-নন্দনে ॥ ১৭

বিততবহুবল্লিনবপল্লবঘনে।
বিলস চিরমলসপীনজঘনে ॥ ১৮ ॥

মধুমুদিতমধুপকুলকলিতরাবে।
বিলস মদনরসসরসভাবে ॥ ১৯ ॥



ওগো পীনজঘনবতি,
নবপল্লবে ঘন, লতায় আচ্ছন্ন কুঞ্জভবনে
আনন্দে রত হও রতিরঙ্গে ॥ ১৮ ॥

মধুমত্ত ভ্রমরের গুঞ্জনে আকুল
ঐ মধুর কুঞ্জভবনে,
আনন্দে সখি পান কর প্রেমঘনরস ॥ ১৯ ॥

মধুরতরপিকনিকরনিনাদমুখরে।
বিলস দশনরুচিরুচিরশিখরে ॥ ২০ ॥

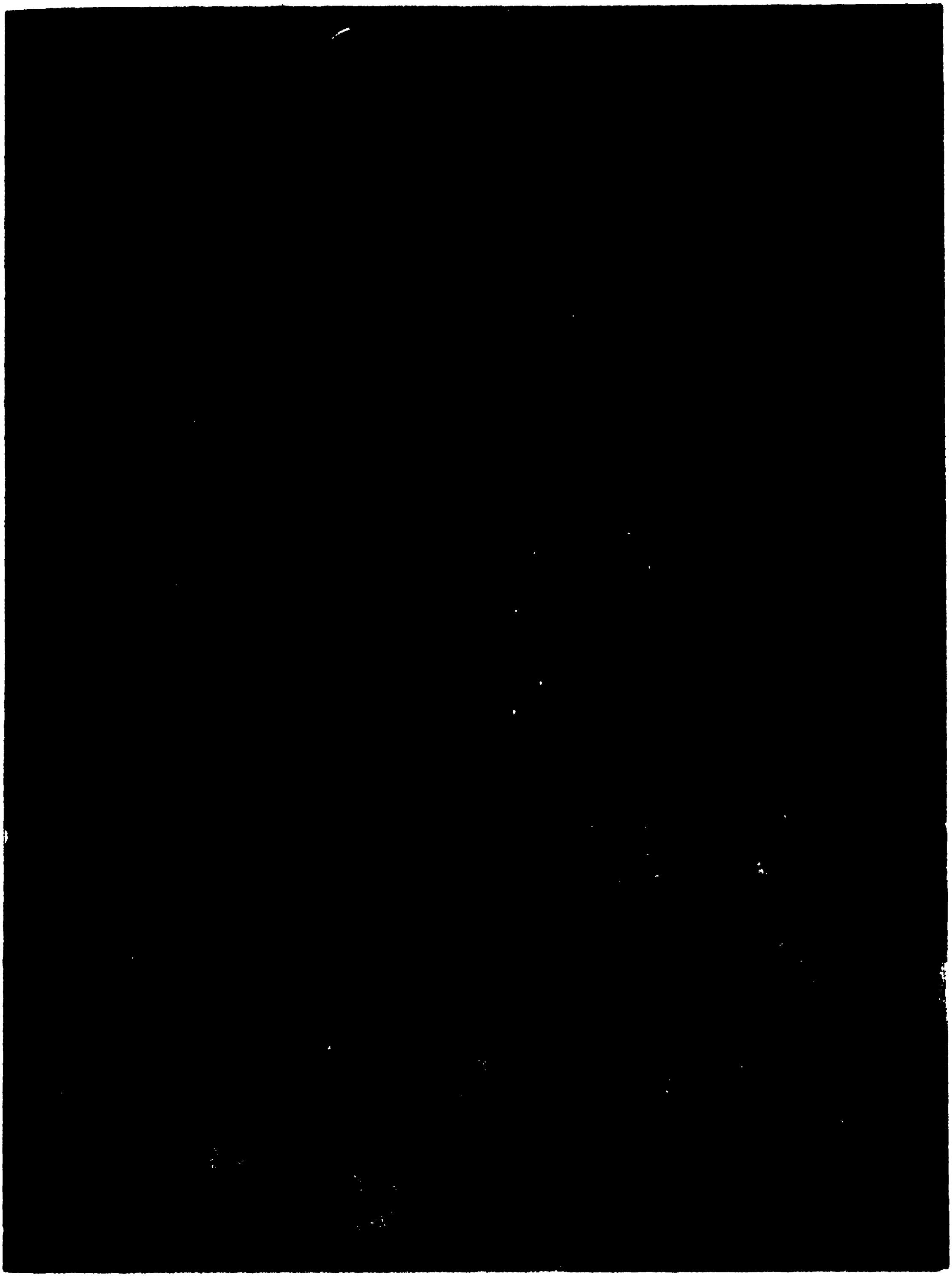
বিহিতপদ্মাবতীসুখসমাজে
কুরু মুরারে মঙ্গলশতানি।
ভণতি জয়দেব-কবিরাজ-রাজে ॥ ২১ ॥



অয়ি শুভ্রদন্তি,
চারিদিকে ঐ শোন উঠছে মধুর পিকরব,
আনন্দে রত হও সখি রতিবিলাসে ॥ ২০ ॥

হে মুরারি,
পদ্মাবতীর আনন্দদায়ী এই যে সঙ্গীত
রচনা করলো কবিরাজ-রাজ জয়দেব,
তোমার প্রসাদে সে-সঙ্গীত হোক্ নিখিলের
মঙ্গলবিধায়ক ॥ ২১ ॥

চিত্রে জয়দেব—



শূন্য মন্দির মোর

ত্বাং চিত্তেন চিরং বহন্নয়মতিশ্রান্তো ভৃশন্তাপিতঃ
কন্দর্পেণ চ পাতুমিচ্ছতি সুধাসম্বাধবিম্বাধরম্।
অস্যাঙ্কং তদলঙ্কুরু ক্ষণমিহ ভ্রূক্ষেপলক্ষ্মীলব-
ক্রীতে দাস ইবোপসেবিতপদাম্ভোজে কুতঃ সংভ্রমঃ ॥ ২২ ॥



ওগো সখি,
বহুক্ষণ ধরে শ্রীকৃষ্ণ বহন করে আছেন তোমাকে
তাঁর অন্তরে।
তাই তিনি পরিশ্রান্ত, প্রেমদাহে ক্লান্ত।
তৃষিত হয়ে আছেন তোমার অধর-সুধার জন্যে।
মিনতি আমার,
এখুনি গিয়ে অলঙ্কৃত কর তাঁর অঙ্কদেশ।
কটাক্ষে যাকে করেছ ক্রীতদাস
সে যদি করে তোমার পাদপদ্মের সেবা,
তাতে আবার লজ্জা কিসের? ॥ ২২ ॥

সা সসাধ্বস-সানন্দং গোবিন্দে লোললোচনা।
শিঞ্জানমঞ্জুমঞ্জীরং প্রবিবেশ নিবেশনম্ ॥ ২৩ ॥

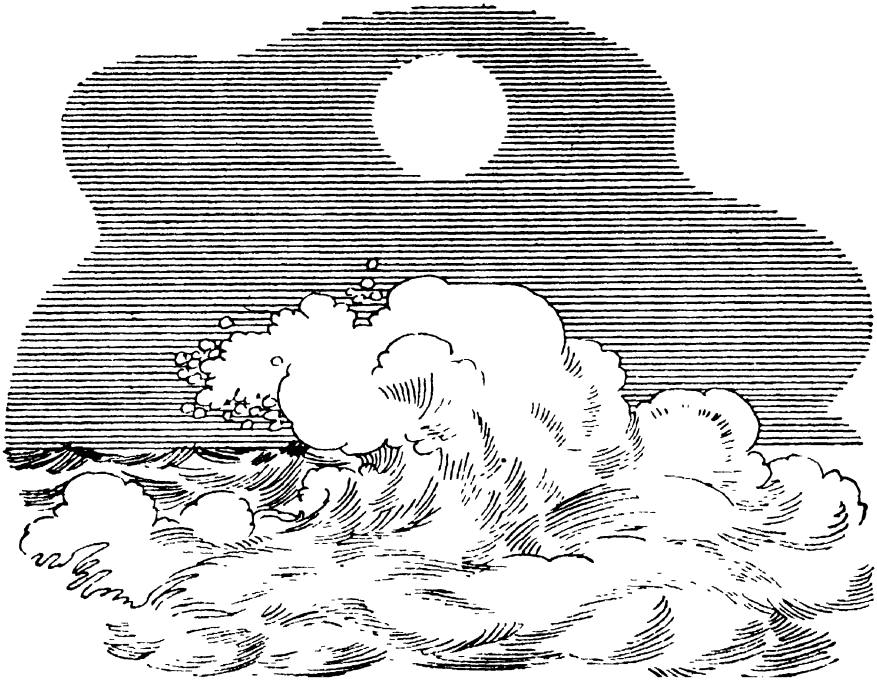


সখীর কথা শুনে
আশঙ্কায় আর আনন্দে দুলে ওঠে শ্রীমতীর বুক।
কটাক্ষ-ইঙ্গিতে গোবিন্দের দিকে একবার চেয়ে
সুমধুর নূপুরের ধ্বনি জাগিয়ে
শ্রীমতী প্রবেশ করেন বাসক-গৃহে ॥ ২৩ ॥

গীতম্

বরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে

রাধাবদনবিলোকন বিকসিত বিবিধবিকারবিভঙ্গম্
জলনিধিমিব বিধুমণ্ডলদর্শনতরলিত-তুঙ্গতরঙ্গম্ ॥
হরিমেকরসং চিরমভিলষিতবিলাসম্
সা দদর্শ গুরুহর্ষ-বশংবদ-বদনমনঙ্গ বিকাশম্ ॥ ২৪ ॥



চাঁদকে দেখলে,
তরঙ্গ-ভঙ্গে যেমন উদ্বেল হয়ে ওঠে সাগর,
শ্রীমতী দেখলেন,
তাঁকে দেখে তেমনি
আনন্দ-রসে উদ্বেল হয়ে উঠেছে গোবিন্দের মুখ
যে অভিলাষ ছিল অন্তরে অপূর্ণ
এখন তা হবে সার্থক পূর্ণ,
সেই আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলো,
শ্রীমতী-গত-প্রাণ গোবিন্দের আনন ॥ ২৪ ॥

হারমমলতর তারমুরসি দধতং পরিলম্ব্য বিদূরম্ ।
স্ফুটতরফেনকদম্বকরম্বিতমিব যমুনাজল-পূরম্ ॥ ২৫ ॥

শ্যামল-মৃদুল-কলেবর-মণ্ডলমধিগতগৌরদুকূলম্ ।
নীলনলিনমিব পীতপরাগপটলভরবলয়িত মূলম্ ॥ ২৬ ॥



যমুনার নীলজলে শুভ্র ফেনার মত
শ্রীহরির নীলবক্ষে শোভা পায় শ্বেত মুক্তাহার ॥ ২৫

স্নিগ্ধ কোমল শ্যাম-অঙ্গে
শোভা পায় পীতবসন,
যেন পীতপরাগে বেষ্টিত নীল-পদ্ম ॥ ২৬ ॥

তরলদৃগঞ্চলবলনমনোহরবদনজনিতরতিরাগম্ ।
স্ফুটকমলোদরখেলিতখঞ্জনযুগমিব শরদিব তড়াগম্ ॥ ২৭ ॥

বদনকমলপরিশীলনমিলিতমিহিরসমকুণ্ডলশোভম্
স্মিতরুচিরুচিরসমুল্লসিতাধরপল্লবকৃতরতিলোভম্ ॥ ২৮ ॥



রতি-রাগ জেগে ওঠে যে মুখের দর্শনে,
শ্যামের সেই স্নিগ্ধ আননে
ফুটে আছে দুটী নীল নয়ন, চঞ্চল কটাক্ষে ভরা,
যেন শরতের স্নিগ্ধ তড়াগে
ফুল্লকমলবনে খেলা করে চঞ্চল খঞ্জন যুগল ॥ ২৭ ॥

শ্যামের মুখকমলে ঝলমল করে যুগলকুণ্ডল
মুখ নয় যেন সূর্য্যমণ্ডল।
ঈষৎ হাসিতে উল্লসিত হয়ে উঠে অধর পল্লব,
দ্বিগুণ করে তোলে রতিলালসা ॥ ২৮ ॥

শশিকিরণচ্ছুরিতোদরজলধরসুন্দরসকুসুমকেশম্‌।
তিমিরোদিত বিধুমণ্ডল নির্ম্মলমলয়জতিলকনিবেশম্‌ ॥ ২৯ ॥

বিপুলপুলকভরদন্তুরিতং রতিকেলিকলাভিরধীরম্‌।
মণিগণ-কিরণসমূহসমুজ্জ্বলভূষণসুভগশরীরম্‌ ॥ ৩০ ॥



কুঞ্চিত কেশদামে তাঁর
জড়িয়ে আছে কুসুমের সুরভিভার,
যেন মেঘের বুকে ছড়িয়ে আছে
চাঁদের আলোর সুষমা।
শ্যামল ললাটে তাঁর
শোভা পায় শ্বেত চন্দন-তিলক,
যেন আঁধার আকাশে শুভ্র চন্দ্রকলা ॥ ২৯ ॥

প্রেমকেলির আশায় উদ্বেল তাঁর শ্রীঅঙ্গ
স্বর্ণে আর মুক্তায়, মণিতে আর ভূষণে করে ঝলমল,
ক্ষণে ক্ষণে হয়ে উঠে বিপুল পুলকে রোমাঞ্চিত ॥ ৩০ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতবিভবদ্বিগুণীকৃতভূষণভারম্ ।
প্রণমত হৃদি বিনিধায় হরিং সুচিরং সুকৃতোদয়সারম্ ॥ ৩১ ॥

অতিক্রম্যাপাঙ্গং শ্রবণপথপর্য্যন্তগমন-
প্রয়াসেনৈবাক্ষ্ণোস্তরলতরতারং পতিতয়োঃ ।
তদানীং রাধায়াঃ প্রিয়তম-সমালোকসময়ে
পপাত স্বেদাম্বুঃপ্রসর ইব হর্ষাশ্রুনিকরঃ ॥ ৩২ ॥



শ্রীজয়দেবের এই সঙ্গীতে
উথলে উঠেছে
শ্যামের সেই অপরূপ রূপবিভব ।
শ্যামের সে-দেহ,
নিখিলের যত পুণ্য তার চির-গেহ ।
ওগো পাঠক, হৃদয়ে ধারণ ক'রে
প্রণাম কর সেই অপরূপ শ্যামমূর্ত্তিকে ॥৩১॥



অন্তরের অন্তরতম প্রাণপ্রিয় সেই কৃষ্ণকে দেখে
চঞ্চল হয়ে ওঠে শ্রীমতীর আঁখিতারা ।
পর্য্যাপ্তভাবে দেখবার জন্যে
সে-আঁখিতারকা শ্রবণমূল পর্য্যন্ত ছুটে চলে ।
তার ফলে দেখা দেয় যে-পরিশ্রান্তি,
আনন্দাশ্রু হয়ে তা পড়ে ঝ'রে ॥ ৩২ ॥

ভজন্ত্যাস্তল্পান্তং কৃতকপটকণ্ডূতিপিহিত-
স্মিতং যাতে গেহাদ্বহিরবহিতালীপরিজনে।
প্রিয়াস্যং পশ্যন্ত্যাঃ স্মরশরসমাকূতসুভগং
সলজ্জা লজ্জাপি ব্যগমদতিদূরং মৃগদৃশঃ ॥ ৩৩ ॥



(প্রিয়-মিলনের শুভ-মুহূর্ত্ত সমাগত বুঝে)
সখীরা হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে
কর্ণকণ্ডূয়নের ছলে।
তখন মৃগনয়না
প্রেমকটাক্ষে চেয়ে দেখেন মাধবকে।
শ্রীমতীর সেই ভাব দেখে
লজ্জাও তখন সলজ্জ হয়ে দূরে যায় স'রে ॥ ৩৩ ॥

জয়শ্রীবিন্যস্তৈর্মহিত ইব মন্দারকুসুমৈঃ
স্বয়ং সিন্দূরেণ দ্বিপ-রণমুদা মুদ্রিত ইব।
ভুজাপীড়ক্রীড়াহতকুবলয়াপীড়করিণঃ
প্রকীর্ণাসৃগ্বিন্দুর্জয়তি ভুজদণ্ডো মুরজিতঃ ॥ ৩৪ ॥



বাহুযুদ্ধে মুরারি যেদিন
নিহত করেন কংসের রণহস্তী কুবলয়াপীড়কে,
তার কুম্ভস্থিত সিন্দূরে আর দেহ-নির্গত রক্তে
রক্তিম হয়ে ওঠে মাধবের ভুজদণ্ড,
যেন জয়লক্ষ্মী নিজে সেই ভুজদণ্ডে
পরিয়ে দিলেন রক্ত-মন্দার-কুসুমের মালা।
মুক্তকণ্ঠে তাই কবি জয়দেব গান গায়,
জয় হোক্ মুরারির সে ভুজদণ্ডের। ॥ ৩৪ ॥

দ্বাদশ সর্গ

সুপ্রীত-পীতাম্বর

এই সর্গ হলো গীতগোবিন্দের শেষ সর্গ। এতক্ষণ ধরে চলেছিল যে দুর্জ্জয় প্রণয়-পরীক্ষা, এখন এসেছে তার সুমধুর পরিসমাপ্তির লগ্ন। বাসকশয্যার সামনে দাঁড়িয়ে পীতাম্বর চেয়ে দেখেন মানিনী শ্রীমতীর কমল-আননের দিকে, দেখেন সে-আননে আর নেই অভিমানের চিহ্ন, তার পরিবর্ত্তে ফুটে উঠেছে সলজ্জ হাসি, ক্ষমার নিদর্শন, মিলন-শয্যার আমন্ত্রণ। সুরু হয় বহু-আকাঙ্ক্ষিত প্রেম-সম্ভোগলীলা। কবি জয়দেব সেই মধুর-মিলনে পাঠকদের পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিচ্ছেন। আমরাও এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি, এই প্রার্থনায়, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে যেখানে চলেছে রাধাকৃষ্ণের নিত্য রাস-লীলা, প্রত্যেক মানুষ যেন হতে পারে সেই নিত্যলীলার সঙ্গী। যে-আনন্দে প্রীত আজ পীতাম্বর সে-আনন্দে কদম্বের মত ফুটে উঠুক প্রত্যেক নর-নারীর অন্তর।



চিত্র জয়দেব



দ্বাদশ সর্গ

সুপ্রীত-পীতাম্বর

গতবতি সখীবৃন্দে মন্দত্রপাভরনির্ভর-
স্মরশরবশাকূতস্ফীতস্মিতস্নপিতাধরাম্ ।
সরসমনসং দৃষ্ট্বা রাধাং মুহুর্নবপল্লব-
প্রসবশয়নে নিক্ষিপ্তাক্ষীমুবাচ হরিঃ প্রিয়াম্ ॥ ১ ॥



সখীরা কুঞ্জভবনের বাইরে চ'লে গেলে,
অধরে স্নিগ্ধ হাসি
রসে ঢল ঢল অন্তর
প্রেমের আবেশে শ্রীমতী
বারবার চেয়ে দেখেন সলজ্জদৃষ্টিতে
সামনেই অপেক্ষা করে রয়েছে কুসুমে রচিত বাসরশয্যা ।
তাই দেখে আনন্দে বলেন শ্রীকৃষ্ণ ॥ ১ ॥

গীতম্

বিভাসরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে

কিশলয়শয়নতলে কুরু কামিনি চরণনলিনবিনিবেশম্ ।
তব পদপল্লববৈরি পরাভবমিদমনুভবতু সুবেশম্ ।
ক্ষণমধুনা নারায়ণমনুগতমনুভজ রাধিকে ॥ ২ ॥



হে রাধিকে,
এই কুসুমশয্যায় রাখ তোমার চরণ-কমল,
তোমার চরণ-কমলের সৌন্দর্য্যে
দূর হোক্ এই কুসুম-শয়নের গর্ব্ব ।
(আর কেন বিলম্ব সখি,)
এই তো নারায়ণ স্বীকার করছে তোমার আনুগত্য,
প্রতিদানে তুমি তাকে কর স্বীকার ॥ ২ ॥

করকমলেন করোমি চরণমহমাগমিতাসি বিদূরম্।
ক্ষণমুপকুরু শয়নোপরি মামিব নূপুরমনুগতিশূরম্ ॥ ৩ ॥



ওগো সখি,
অনেক দূরপথ অতিক্রম ক'রে তুমি এসেছ,
দাও তোমার ক্লান্ত চরণ দুটী
সেবা করি আমার করপদ্ম দিয়ে।
ক্ষণকালের জন্যে হলেও
তোমার ঐ চরণলগ্ন নূপুরের মত
শয্যাপ্রান্তে তোমার চরণে দাও স্থান ॥ ৩ ॥

বদনসুধানিধি গলিতমমৃতমিব রচয় বচনমনুকূলম্।
বিরহমিবাপনয়ামি পয়োধররোধকমুরসি দুকূলম্ ॥ ৪ ॥



ওগো সখি,
তোমার ঐ আননের সুধানিধি থেকে
বর্ষণ কর মধুবচনের ধারা,
করুক আনন্দে আমাকে তা অভিষিক্ত।
(অনুমতি দাও)
বিরহ-বাধার মতন ঐ তোমার বক্ষবাস,
যা দিয়ে রুদ্ধ ক'রে রেখেছ তোমার পয়োধরকে,
নিজের হাতে দিই অপসারিত ক'রে ॥ ৪ ॥

প্রিয়পরিরম্ভণরভসবলিতমিব পুলকিতমতিদুরবাপম্ ।
মদুরসি কুচকলসং বিনিবেশয় শোষয় মনসিজতাপম্ ॥ ৫ ॥

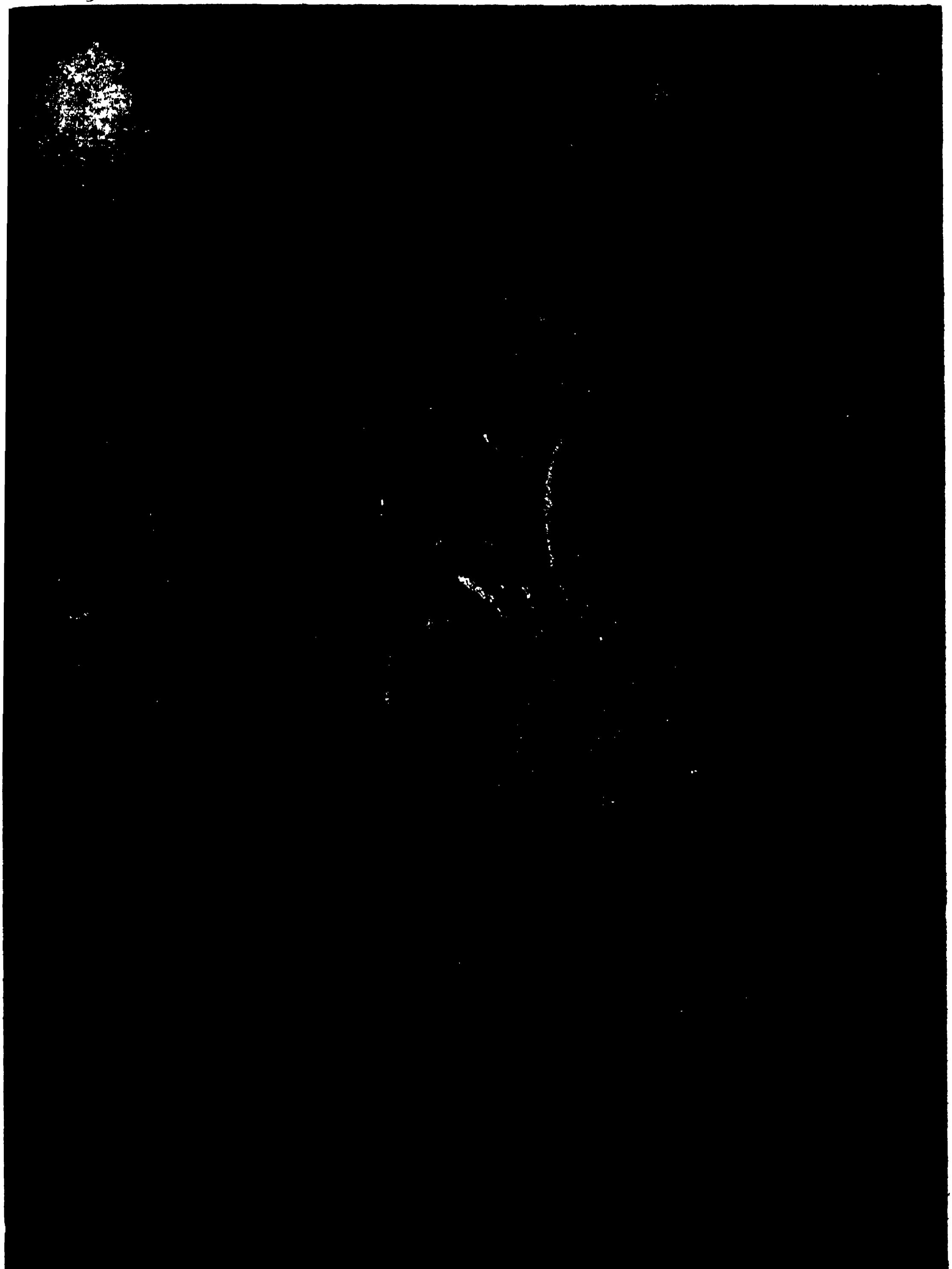
অধরসুধারসমুপনয় ভামিনি জীবয় মৃতমিব দাসম্ ।
ত্বয়ি বিনিহিতমনসং বিরহানলদগ্ধবপুষমবিলাসম্ ॥ ৬ ॥



প্রিয়স্পর্শের আশায় অতি-
দুর্লভ তোমার ঐ কুচকলস,
ওগো সখি,
রাখ আমার বুকে,—
স্নিগ্ধ হোক্ অন্তরের প্রেমদাহ ॥ ৫ ॥

ওগো ভামিনি,
তোমাতে অর্পিত যার মনপ্রাণ,
সুখবিলাসের অভাবে আর বিরহের অনলে
দগ্ধ মৃতপ্রায় যে দাস,
তোমার ঐ অধরের সুধা দিয়ে
তাকে করে তোল সঞ্জীবিত ॥ ৬ ॥

চিত্রে জয়দেব—



বঁধু কি আর বলিব আমি-

শশিমুখি মুখরয় মণিরসনাগুণমনুগুণকণ্ঠনিনাদম্ ।
শ্রুতিপুটযুগলে পিকরুতবিকলে শময় চিরাদবসাদম্ ॥ ৭ ॥



ওগো শশিমুখি,
আকুল পিকরব করেছে বিকল আমার শ্রবণকে ।
তোমার কণ্ঠকে যে করে অনুকরণ
সেই তোমার মণিময় কাঞ্চীর ঝংকারে
দূর কর তার অবসাদ ॥ ৭ ॥

মামতিবিফলরুষা বিকলীকৃতমবলোকিতুমধুনেদম্ ।
মীলতি লজ্জিতমিব নয়নং তব বিরম বিসৃজ রতিখেদম্ ॥ ৮ ॥



তোমার অকারণ ক্রোধ
আমাকে করেছিল বিহ্বল বিকল ;
তাই বুঝি আমাকে দেখে
লজ্জায় মুদে আসছে তোমার নয়ন ?
আমার কথা শোন,
সে সব কথা ভুলে গিয়ে আমার প্রতি প্রসন্ন হও,
পরিত্যাগ কর এই প্রেমবৈরী ভাব ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেব ভণিতমিদমনুপদনিগদিতমধুরিপুমোদম্‌।
জনয়তু রসিকজনেষু মনোরমরতিরসভাববিনোদম্‌ ॥ ৯ ॥

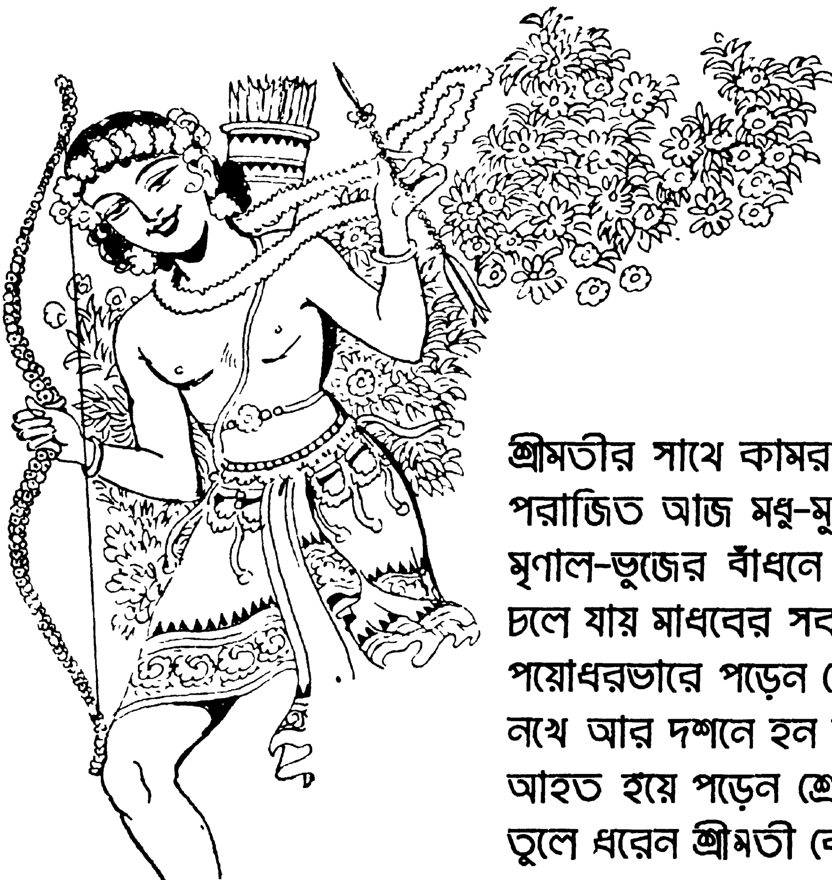
প্রত্যূহঃ পুলকাঙ্কুরেণ নিবিড়াশ্লেষে নিমেষেণ চ
ক্রীড়াকূতবিলোকিতেঽধরসুধাপানে কথানর্ম্মভিঃ।
আনন্দাধিগমেন মন্মথকলাযুদ্ধেঽপি যস্মিন্নভু-
দুদ্ভূতঃ স তয়োর্ব্বভুব সুরতারম্ভঃ প্রিয়ম্ভাবুকঃ ॥ ১০ ॥



জয়দেবকবি প্রতিপদে আজ
গেয়ে চলে মাধবের প্রেম-উল্লাস।
যে রতিরসের আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছে
কৃষ্ণের বক্ষ,
সে-আনন্দে নেচে উঠুক রসিকজনের
চিত্ত ॥ ৯ ॥

সুরু হলো শ্যামের বিচিত্র রতি-রঙ্গ-লীলা
গাঢ় আলিঙ্গনের সময়,
দেহে জেগে ওঠে পুলকের রোমাঞ্চ,
সে-রোমাঞ্চ সৃজন করে মিলনের সূক্ষ্ম বাধা;
প্রিয়তমার মুখ দর্শনে বাধা হয় চোখের পলক;
মুখচুম্বনের কালে বাধা হয় মুখের বচন;
রতি-রণে বাধা জাগায় অন্তরের ঘন-আনন্দ।
তবু কৃষ্ণ-রতির সব বাধাই
পরিণামে এনে দেয় মহাহর্ষ ॥ ১০ ॥

দোর্ভ্যাং সংযমিত পয়োধরভরেণাপীড়িতঃ পাণিজৈ
রাবিদ্ধো দশনৈঃ ক্ষতাধরপুটঃ শ্রোণীতটেনাহতঃ।
হস্তেনানমিতঃ কচেঽধরসুধাপানেন সম্মোহিতঃ
কান্তঃ কামপি তৃপ্তিমাপ তদহো কামস্য বামা গতিঃ ॥ ১১ ॥



শ্রীমতীর সাথে কামরণে
পরাজিত আজ মধু-মুর-জয়ী।
মৃণাল-ভুজের বাঁধনে
চলে যায় মাধবের সব শক্তি,
পয়োধরভারে পড়েন ভেঙ্গে,
নখে আর দশনে হন ক্ষতবিক্ষত,
আহত হয়ে পড়েন শ্রোণীতটে,
তুলে ধরেন শ্রীমতী কেশ
আকর্ষণ করে,
তবু মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন শ্রীহরি
অধরে সুধার স্পর্শে,—
কি মধুর সে-মূর্চ্ছা, কি অপরূপ সে-পরাভব।
বিচিত্র কামের গতি ॥ ১১ ॥

মারাঙ্কে রতিকেলিসঙ্কুলরণারম্ভে তয়া সাহস-
প্রায়ং কান্তজয়ায় কিঞ্চিদুপরি প্রারম্ভি যৎ সম্ভ্রমাৎ।
নিস্পন্দা জঘনস্থলী শিথিলতা দোর্ব্বল্লিরুৎকম্পিতম্
বক্ষো মীলিতমক্ষি পৌরুষরসং স্ত্রীণাং কুতঃ সিধ্যতি ॥ ১২ ॥



কান্ত জয়ের লালসায়
চরম দুঃসাহসে আজ
শ্রীমতী আরোহণ করেছেন
কৃষ্ণের বক্ষে,
মেতেছেন রতি-রণের উল্লাসে।
কিন্তু হায় নারী!
বিপরীত সেই চেষ্টায়
নিস্পন্দ হয়ে আসে ঘনজঘন,
শিথিল হয়ে আসে বাহুলতা,
মুহুর্মুহু কেঁপে ওঠে বুক,
মুদে আসে চোখের পাতা……
কোথা পাবে নারী পৌরুষ-রস? ॥ ১২ ॥

মীলদ্দৃষ্টিমিলৎকপোলপুলকং শীৎকারধারাবশা-
দব্যক্তাকুলকেলিকাকুবিকসদ্দন্তাংশুধৌতাধরম্‌।
শ্বাসোন্নদ্ধপয়োধরোপরিপরিষ্বঙ্গী কুরঙ্গীদৃশো
হর্ষোৎকর্ষবিমুক্তিনিঃসহতনোর্ধন্যো ধয়ত্যাননম্‌ ॥ ১৩ ॥



আনন্দের আতিশয্যে অবসন্না
শ্রীমতীর শ্বাসস্ফীত কুচযুগল মর্দন ক'রে
শ্রীকৃষ্ণ রত হন অধর সুধাপানে।
তখন মুদে আসে রাধার দুনয়ন,
পুলকে রক্তিম হয়ে ওঠে কপোল,
অধর থেকে উঠতে থাকে অবিচ্ছিন্ন শীৎকার,
উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মুখ শুভ্রদশনের নীরব কিরণে ॥ ১৩

তস্যাঃ পাটলপাণিজাঙ্কিতমুরো নিদ্রাকষায়ে দৃশৌ
নির্ধৌতোঽধরশোণিমা বিলুলিতাঃ স্রস্তস্রজো মূর্দ্ধজাঃ।
কাঞ্চীদাম দরশ্লথাঞ্চলমিতি প্রাতর্নিখাতৈর্দৃশো-
রেভিঃ কামশরৈস্তদদ্ভুতমভূৎ পত্যুর্মনঃ কীলিতম্ ॥ ১৪ ॥



প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ দেখেন,
নখে ক্ষতবিক্ষত রাধার বক্ষ,
আবেশে আরক্ত দুই নয়ন,
মুছে গিয়েছে অধরের কুঙ্কুম রাগ,
ছিন্ন হয়ে গিয়েছে কুসুমের মালা,
এলিয়ে পড়েছে কেশপাশ,
শিথিল পড়ে আছে মেখলা,
রাধার সর্ব্ব-অঙ্গ মদনের শরে বিদ্ধ।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য,
সেই শরে আবার বিদ্ধ হয় শ্রীকৃষ্ণের অন্তর ॥ ১৪ ॥

ব্যালোলঃ কেশপাশস্তরলিতমলকৈঃ স্বেদলোলৌ কপোলৌ
ক্লিষ্টা দষ্টাধরশ্রীঃ কুচকলসরুচাহারিতা হারযষ্টিঃ।
কাঞ্চী কাঞ্চিদ্‌গতাশাং স্তনজঘনপদং পাণিনাচ্ছাদ্য সদ্যঃ
পশ্যন্তী সত্রপং মাং তদপি বিলুলিতস্রগ্ধরেয়ং ধিনোতি ॥ ১৫ ॥



মনে মনে ভাবেন শ্রীকৃষ্ণ,
শ্রীমতীর কেশপাশ আলুলায়িত,
বিপর্য্যস্ত অলক, ঘর্ম্মাক্ত কপোলদেশ,
অধরে দশনাঘাতচিহ্ন,
কণ্ঠ থেকে ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছে ফুলহার,
মেখলা গিয়েছে স্থানচ্যুত হয়ে,
মর্দ্দিত কুচকলসের গায় তিরস্কৃত পড়ে আছে ছিন্ন হার।
তবু সেই অবস্থায়,
হাত দিয়ে ঢেকে আহত-স্থান
আনন্দে চেয়ে আছেন শ্রীমতী আমারি দিকে ॥ ১৫ ॥

ইতি মনসা নিগদন্তং সুরতান্তে সা নিতান্তখিন্নাঙ্গী
রাধা জগাদ সাদরমিদমানন্দেন গোবিন্দম্ ॥ ১৬ ॥

গীতম্

(রামকিরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে)

কুরু যদুনন্দন চন্দনশিশিরতরেণ করেণ পয়োধরে
মৃগমদপত্রকমত্র মনোভবমঙ্গলকলসসহোদরে।
নিজগাদ সা যদুনন্দনে ক্রীড়তি হৃদয়ানন্দনে ॥ ১৭ ॥



প্রেমকেলি অবসানে খিন্নদেহা শ্রীমতী
গোবিন্দকে দেখেন চিন্তাকুল।
তাই আদরে বলেন সুমধুর বচন ॥ ১৬ ॥

রাধার হৃদয়বনবিহারী ওগো চিরানন্দময়,
হে যদুনন্দন, চন্দনের চেয়ে শীতল
তোমার ঐ শ্রীকর দিয়ে,
মদনের মঙ্গলকলস আমার এই কুচযুগলে
এঁকে দাও মৃগমদের স্নিগ্ধ পত্রলেখা ॥ ১৭ ॥

অলিকুলগঞ্জনসঞ্জনকং রতিনায়কশায়কমোচনে
তদধরচুম্বনলম্বিতকজ্জলমুজ্জ্বলয় প্রিয়লোচনে ॥ ১৮ ॥

নয়নকুরঙ্গতরঙ্গবিকাশনিরাসকরে শ্রুতিমণ্ডলে।
মনসিজপাশবিলাসধরে-শুভবেশ নিবেশয় কুণ্ডলে ॥ ১৯ ॥



মদনের পুষ্পবাণকে ঢেকে রাখবার জন্যে
যে-নয়নে দিয়েছিলাম কাজল,
তোমার চুম্বনে চুম্বনে
মুছে গিয়েছে সে কাজলের রেখা,
ওগো প্রিয়তম, তোমার নিজের হাতে আবার
কজ্জলে তাদের করে দাও সমুজ্জ্বল ॥ ১৮ ॥

ওগো সুন্দর, শুভবেশ নয়নের দৃষ্টির তরঙ্গ
পাছে সীমা ছড়িয়ে চলে যায়,
তাই শ্রবণের তটে তা বাঁধা।
তোমার নিজের হাতে সেই শ্রবণের তটে
বেঁধে দাও কুণ্ডল,
দুলুক তা মদনের পাশের মতন ॥ ১৯ ॥

ভ্রমরচয়ং রচয়ন্তমুপরি রুচিরং মম সম্মুখে
জিতকমলে বিমলে পরিকর্ম্ময় নর্ম্মজনকমলকং মুখে ॥ ২০ ॥

মৃগমদরসবলিতং ললিতং কুরু তিলকমলিকরজনীকরে
বিহিতকলঙ্ককলং কমলানন বিশ্রমিতশ্রমশীকরে ॥ ২১ ॥



জিতকমল আমার এই মুখের ওপর
এসে পড়েছে শিথিল এলোচুল;
তাই দেখে সখীরা করছে পরিহাস।
তুমি নিজের হাতে রচনা করে দাও
নতুন করে ভ্রমরকবেণী ॥ ২০ ॥

ললাটে আমার মুছে দাও ঘর্ম্মবারি,
সেখানে রচনা করে দাও
শিশুচাঁদের মৃগমদ তিলক ॥ ২১ ॥

মম রুচিরে চিকুরে কুরু মানদ মানসজধ্বজচামরে
রতিগলিতে ললিতে কুসুমানি শিখণ্ডিশিখণ্ডকডামরে ॥ ২২ ॥



ওগো মানদ !
মদনের ধ্বজ-চামরের মতন
আমার এই কেশদাম,
ময়ূরপুচ্ছের গৌরবকে যা দেয় লজ্জা,
প্রেমরতির সময় তা থেকে ঝরে পড়ে গিয়েছে কুসুম,
তুমি নিজের হাতে আবার
নতুন কুসুমে সাজিয়ে দাও সে-কেশদাম ॥ ২২ ॥

সরসঘনে জঘনে মম শম্বরদারণবারণকন্দরে।
মণিরসনাবসনাভরণানি শুভাশয় বাসয় সুন্দরে ॥ ২৩ ॥

শ্রীজয়দেববচসি রুচিরে হৃদয়ং সদয়ং কুরু মণ্ডনে।
হরিচরণস্মরণামৃতনির্ম্মিতকলিকলুষজ্বরখণ্ডনে ॥ ২৪ ॥



ওগো চিরমঙ্গল,
মদনমাতঙ্গের আশ্রয় আমার এই ঘনজঘন,
তুমি নিজের হাতে আবার ভূষিত করে দাও
মণিময় ভূষণে আর পীতবসনে ॥ ২৩ ॥

কলির পাপতাপ-বিমোচনকারী
শ্রীহরির চরণস্মরণরূপ অমৃতে,
জয়দেবকবি অভিষিক্ত করলো তার সঙ্গীতকে।
প্রার্থনা করি ভক্ত-হৃদয়ে তা বিরাজ করুক
অক্ষয় অলংকারের মতন ॥ ২৪ ॥

[দু'শ তিপ্পান্ন]

রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ্ব কপোলয়ো-
র্ঘটয় জঘনে কাঞ্চীমঞ্চ স্রজা কবরীভরম্ ।
কলয় বলয়শ্রেণীং পাণৌ পদে কুরু নূপুরা-
বিতি নিগদিতঃ প্রীতঃ পীতাম্বরোঽপি তথাকরোৎ ॥ ২৫ ॥



পয়োধরে দাও নব পত্রলেখা,
কপোলে লেপন কর চন্দনরেখা,
জঘনে দাও পরিয়ে কাঞ্চী,
দুলিয়ে দাও কবরীতে মালা,
করেতে পরাও স্বর্ণবলয়, চরণে দাও নূপুর।
শ্রীমতীর এই আদেশ
আনন্দিতচিত্তে যথাযথ পালন করেন পীতাম্বর ॥ ২৫ ॥

পর্য্যঙ্কীকৃতনাগনায়কফণাশ্রেণীমণীনাং গণে
সংক্রান্তপ্রতিবিম্বসংবলনয়া বিভ্রদ্বিভুপ্রক্রিয়াম্ ।
পাদাম্ভোরুহধারিবারিধিসুতামক্ষ্ণাং দিদৃক্ষুঃ শতৈঃ
কায়ব্যূহমিবাচরন্নুপচিতীভূতো হরিঃ পাতু বঃ ॥ ২৬॥



শুয়ে আছেন যিনি শতশির শেষনাগের আসনে,
শতশির থেকে যার ঝলসে পড়ছে শত মণির আলো,
সেই শত মণির আলোয় যিনি রচনা করে আছেন
শতমূর্তির প্রতিবিম্ব
শত শত নয়নে দেখবার জন্যে
চরণসেবারতা সমুদ্রসুতা লক্ষ্মীকে,
সেই শ্রীহরি রক্ষা করুন আপনাদের সকলকে ॥ ২৬ ॥

যদ্‌গান্ধর্ব্বকলাসু কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবং
যচ্ছৃঙ্গারবিবেকতত্ত্বমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতম্
তৎ সর্ব্বং জয়দেবপণ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ ॥ ২৭ ॥



হে সুধী।
যদি সঙ্গীতশাস্ত্রের রাগরাগিণীতে থাকে তোমার প্রীতি,
সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর ধ্যানে যদি থাকে তোমার আগ্রহ,
বিবেকতত্ত্ব আর শৃঙ্গাররসকাব্যে নিপুণতালাভের
যদি থাকে বাসনা,
তাহলে আনন্দের সঙ্গে কর পাঠ
কৃষ্ণগতপ্রাণ কবিপণ্ডিত জয়দেবের রচনা
এই শ্রীগীতগোবিন্দ ॥ ২৭ ॥

[তু'শ ছাপান্ন]



একা কৃষ্ণ একশো হ'য়ে
নাচে রাসরঙ্গে।

সাধ্বী মাধ্বীকচিন্তা ন ভবতি ভবতঃ শর্করে কর্করাসি
দ্রাক্ষে দ্রক্ষ্যন্তি কে ত্বামমৃত মৃতমসি ক্ষীর নীরং রসস্তে।
মাকন্দ ক্রন্দ কান্তাধর ধরণিতলং গচ্ছ যচ্ছন্তি যাব-
দ্ভাবং শৃঙ্গারসারস্বতমিহ জয়দেবস্য বিষ্বগ্বচাংসি ॥ ২৮ ॥

শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামাদেবীসুতশ্রীজয়দেবকস্য
পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্বমস্তু ॥ ২৯ ॥

যতদিন পৃথিবীতে থাকবে
জয়দেবকবির এই শৃঙ্গারকাব্য,
হে মধু, মধুর বলে আর কেউ তোমাকে চাইবে না।
শর্করা, হবে কর্কশতাময়……
দ্রাক্ষা, কেউ দেখবে না আর তোমাকে,
অমৃত, মৃত হয়ে থাকবে তুমি,
ক্ষীরের আস্বাদ মনে হবে নীরের মতন,
মধুর আম্রফল শোকে করবে ক্রন্দন,
কান্তাধর যাবে রসাতলে ॥ ২৮ ॥

পিতা শ্রীভোজদেব,
জননী বামাদেবী,
তাঁদের সন্তান জয়দেবকবি
এই শ্রীগীতগোবিন্দকাব্য রচনা করে
উপহার দিল
প্রিয়বন্ধু পরাশর আর অন্য সব সুহৃদের কণ্ঠে ॥ ২৯ ॥

শ্রীজয়দেব-কবি-লিখিত

গীতগোবিন্দ-কাব্যের

পরিসমাপ্তিতে



জয়তু রাধামাধব

জয়তু রাধামাধব

জয়তু রাধামাধব

চিত্রে জয়দেব

গীতগোবিন্দ

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

প রি শি ষ্ট

বাংলার জাতীয় জীবনে গীতগোবিন্দের স্থান

বাংলার জাতীয় জীবনের সঙ্গে কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, এক-একটা যুগকে প্রভাবান্বিত করে যেমন এক-একজন মহাপুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন, তেমনি মানুষের এগিয়ে-চলার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে এক-একখানি বই; সেই এক-একখানি বই-এর ভেতর যে-আলো, যে-শক্তি জমা হয়ে থাকে, তা থেকে পরবর্ত্তী যুগ আলোকিত হয়ে ওঠে। যিশুর আবির্ভাবের আগে যেমন জন দি ব্যাপটিষ্ট এসে তাঁর আগমনের পথকে তৈরী করেছেন, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে যেমন এসেছেন অদ্বৈত আচার্য্য, ঠিক তেমনি এক-একটা যুগান্তরকারী আন্দোলনের আগে এসেছে এক-একখানি বই···সেই সব অগ্রগামী বাণীদূতের ভাব-বন্যায় পুরাণো জীর্ণ নোংরামি সব ভেসে গিয়েছে, নতুন করে তৈরী হয়েছে মানুষের মনের ক্ষেত্র, যার ফলে সম্ভব হয়েছে নতুন আন্দোলন।

পৃথিবীর সমস্ত বড় আন্দোলনের ইতিহাসে দেখা যায় এই একই প্রক্রিয়া, সাহিত্য আগে এসে ক্ষেত তৈরী করেছে, তারপর সেই তৈরী ক্ষেতের ওপর গজিয়ে উঠেছে নতুন আন্দোলনের সবুজ শস্য। ফরাসী বিপ্লবের আগে তাই দেখি ভল্‌টেয়ার আর রুশোর সাহিত্য, রুশ-বিপ্লবের আগে দেখি গোগল থেকে আরম্ভ করে গর্কী পর্য্যন্ত সাহিত্যিকদের অবিরাম সাধনা, বাংলাদেশে স্বদেশী-আন্দোলনের আগে দেখি আনন্দমঠের সৃষ্টি, বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের আবির্ভাব।

ইংরেজ-আগমনের আগে পর্য্যন্ত বাংলার জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় বিপ্লব সংসাধিত হয় চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে। শাস্ত্র, পুঁথি আর জাতিভেদের অপব্যবহারে

বাংলা যেদিন ভেতর থেকে প্রাণহীন, শক্তিহীন হয়ে ভেঙ্গে পড়ছিল, বাইরে থেকে যেদিন একটা প্রবল বিরুদ্ধ শক্তি সেই ভেতরের ভাঙ্গনের সুযোগ গ্রহণ করে সমস্ত দেশটার চেহারা বদলাতে চলেছিল, সেই সময় চৈতন্যদেব আচণ্ডাল সকল মানুষকে মানবতার সহজ অধিকারে আহ্বান করে এক মহান্ ধর্ম্ম-বিপ্লব নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সেই বিপ্লবের অগ্রদূত—জয়দেব কবি এবং তাঁর রচিত অমরকাব্য গীতগোবিন্দ। গীতগোবিন্দের অক্ষরে অক্ষরে, তার সুরে, তার ছন্দে জয়দেব কবি সর্ব্বগ্লানি-শোধক প্রেমের যে পাবক শক্তির উদ্দীপন করলেন, চূর্ণ-বিগ্রহ জীবনের মন্দিরে প্রেমের অমর দেবতার যে নব-আরতি করলেন, তার প্রভাবে সেদিন বাংলার বিভ্রান্ত জনমানসে এক নতুন চেতনা জেগে ওঠে। বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে গীতগোবিন্দের প্রভাব বুঝতে হলে, জয়দেবের সময়কার বাংলার জাতীয় ও সামাজিক জীবনের চিত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার।

রাজনৈতিক পরাধীনতায় বাংলার জাতীয় জীবন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। পরাধীনতা বহু জাতির ভাগ্যে ঘটে কিন্তু সেই সময়কার পরাধীন বাংলার ছবি দেখলে বোঝা যায় যে, যে-জাতির সামাজিক জীবনে ব্যক্তিগত চরিত্রের মূল্য ও মর্য্যাদা নষ্ট হয়ে যায়, সে-জাতির পুনরুদ্ধারের আর কোন আশা থাকে না। একটা সমগ্র জাত তখন ধীরে ধীরে নির্বীর্য্যতার খাদের শেষতলের দিকে গড়িয়ে চলেছিল। এবং এই জাতীয় চরিত্রের অধোগতির সব চেয়ে বড় লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যৌন-বিকারে ও ব্যভিচারে।

জীবনের আর সব ক্ষেত্র থেকে সরে এসে, ধর্ম্মের আড়ালে তখনকার বাঙালীরা নিছক কামচর্চ্চা ও যৌন-লিপ্সার মধ্যে ডুবে ছিল। সমাজের উচ্চস্তরে চলেছিল তন্ত্র-সাধনার বিকৃতির ফলে নারী-মাংসের পংক্তি-ভোজন, সমাজের নিম্নস্তরে কোন আড়ালেরই প্রয়োজন ছিল না, প্রকাশ্য দিবালোকে পথেঘাটে চলতো সুরামত্তের আর বারাঙ্গনার দ্বৈতনৃত্য। যে-নদীয়ায় আসেন চৈতন্যদেব, সেই নদীয়ার গঙ্গার ঘাটে ঘাটে বসতো সুরাপায়ীদের আসর, বারাঙ্গনাদের উৎসব-সভা। এই যৌন-বিকার ও ইন্দ্রিয়-আসক্তির নির্লজ্জ প্রসারে ডুবে যেতে বসেছিল জাতির চেতনা। সেই সময় জয়দেব তাঁর অমর সঙ্গীতের ঝংকারে নিয়ে এলেন প্রেমের পাবক বাণী, মানব-জীবনের সামনে তুলে ধরলেন সঞ্জীবনী সুধা। তাঁর চরম বৈশিষ্ট্য হলো, এই আদর্শ তিনি তত্ত্বকথা বা উপদেশের ইষ্টকরূপে বিভ্রান্ত জনতার ওপর নিক্ষেপ করলেন না। জগতের শ্রেষ্ঠ কবি ও শিল্পীদের মত তিনি অন্তর থেকে জানতেন, যে-পিপাসায় বিভ্রান্ত হয়ে মানুষ নিজের হাতে বিষ-পাত্র গ্রহণ করে, সে-পিপাসা মানুষের জীবনে একান্ত সত্য। সেই পিপাসার একমাত্র তৃপ্তি হলো, রসের আস্বাদনে। তাই

মহাকবিরা রসের ভেতর দিয়ে যে সুধা পরিবেশন করেন, তার মূল্য শত উপদেশ গ্রন্থ বা তত্ত্বকথার গ্রন্থের চেয়ে বেশী। এই রসের মন্ত্র হলো সব চেয়ে বড় পাবক মন্ত্র।

জয়দেব সেই রসের পাবক মন্ত্রে সেই সময়কার বাংলার তৃষ্ণা-বিভ্রান্ত চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে গেলেন। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে এক শ্রেণীর চিকিৎসক যেমন খাদ্যের ভেতর দিয়ে রোগ-চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, খাদ্যের ভেতরেই ওতপ্রোতভাবে থেকে যায় অসুস্থ দেহের প্রয়োজনীয় ঔষধ, তেমনি জগতের মহাকবিরা রসের ভেতর দিয়েই করেন ব্যাধিগ্রস্ত মানবতার চিকিৎসা। তাই প্রতিদিনের জগতের হিসাবী লোকেরা কবিদের রস-সাধনাকে যেখানে অবাস্তব বলে বিজ্ঞতার পরিচয় দেয়, জগতের বিজ্ঞ-লোকেরা সেখানে সুনিশ্চিত ভাবে জানেন মহাকবিদের এই রস-সাধনার মধ্যেই আছে সামাজিক ব্যাধির একান্ত প্রয়োজনীয় পরমৌষধি।

তাই জয়দেবের গীতগোবিন্দ যেমন একদিক থেকে হলো কাব্যের রসঘনমূর্ত্তি; যে-প্রেম হলো জীবনের ধাত্রী, যাকে আলঙ্কারিকেরা বলেছেন আদিরস, সংস্কৃত ভাষায় সেই আদিরসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লিরিক কবিতা, তেমনি আর একদিক থেকে এই কাব্য তার আদি-রসেরই অপূর্ব্ব পাবকরসায়নে বাংলার চিত্তভূমিকে চিরকালের মতন সরস আর্দ্র করে দিয়ে যায়। পুঁথির শুষ্ক অনুশাসন আর বুদ্ধির বন্ধ্যা যুক্তিকে পরিত্যাগ করে পরবর্ত্তী যুগে চৈতন্যদেব প্রেম ও ভক্তির যে মহাবীর্য্য ও প্রাণ-ঐশ্বর্য্যকে জাগিয়ে তুললেন, সাহিত্যে তার ভিত্তি তৈরী করেন তিনজন কবি—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও জয়দেব।



সাহিত্য হিসাবে গীতগোবিন্দ

ভারতীয় সাহিত্য বলতে একদিন বোঝাত সংস্কৃত-সাহিত্য। হিন্দু-ভারতের সমস্ত সংস্কৃতি, প্রাণ ও মনের সমস্ত ঐশ্বর্য্য পড়ে আছে সংস্কৃতের অক্ষয় ভাণ্ডারে। রাজনৈতিক উত্থান-পতন এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের অভিশাপের ফলে এই বিরাট সাহিত্যের বিপুল অংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সংস্কৃত-কাব্যের ইতিহাসে আমরা কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ ইত্যাদি কয়েকজনের নাম ও কীর্ত্তির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত, কিন্তু শত শত প্রতিভাবান্ কবি এই ভারতবর্ষে জন্মেছেন, যাঁদের রচিত গ্রন্থের আজ আর কোন নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন বহু কবি আছেন, যাঁদের হয়ত একটি শ্লোক পড়ে আছে, না হয় দুটী শ্লোক, কিন্তু সেই দু-একটী শ্লোকের ভেতরই তাঁদের অসামান্য প্রতিভার বিদ্যুৎ-দীপ্তি সহজেই চোখে পড়ে। এই বিরাট কাব্যের স্রোতস্বিনী যুগ যুগ ধরে অবিচ্ছেদ ধারায় প্রবাহিত হয়ে যেখানে এসে শেষ হয়েছে, সেখানে বিরাজ করছেন জয়দেব কবি। জয়দেবের পর যে সংস্কৃত ভাষায় কবি জন্মগ্রহণ করেননি, সেকথা বলছি না, জয়দেব হলেন সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের শেষতম প্রতিভাধর অমর কবি। জয়দেবের গীতগোবিন্দকাব্য সংস্কৃত সাহিত্য আর দেশজ প্রাকৃতভাষার সাহিত্যের সন্ধিক্ষণে বিরাজ করছে।

গীতগোবিন্দের ভেতর যেমন একদিকে দেখা যায় বহুকাল বহমান সংস্কৃত ভাষার শেষ-বিবর্ত্তনের রূপ, তেমনি তার মধ্যে দেখা যায় নতুন বাংলা সাহিত্যের জন্মের সূচনা। গীতগোবিন্দের ভাষার সঙ্গে কালিদাস ভবভূতির ভাষার পার্থক্য পড়তে গেলেই চোখে পড়ে। গীতগোবিন্দের বহু শ্লোকে সংস্কৃত-ব্যাকরণের চিহ্ন প্রায়ই চোখে পড়ে না, দু-একটা অনুস্বার আর বিসর্গ বাদ দিলেই সেটা বাংলা ভাষার মতন শোনায়। সেই জন্যে সাহিত্যের ইতিহাসে গীতগোবিন্দ একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

ভাষা-শিল্পী হিসাবে জয়দেব একদিকে অতুলনীয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করেছেন। সংস্কৃত ভাষার শব্দ-বিন্যাসের মধ্যে যতখানি মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য থাকা সম্ভব, শব্দ-শিল্পী

জয়দেব তা পরিপূর্ণমাত্রায় ফুটিয়ে তুলেছেন। স্থপতি যেমন বাটালির ডগায় কুরে কুরে পাথরকে মোলায়েম করে, জয়দেব তেমনি ভাবে প্রত্যেক অক্ষরটী কুরে কুরে বসিয়েছেন কিন্তু তাঁর প্রতিভার চরম বৈশিষ্ট্য হলো যে এই অতি দুরূহ কাজে কোথাও তাঁর বিন্দুমাত্র চেষ্টা ধরা পড়েনি। শ্রেষ্ঠ স্থপতির তৈরী অনুপম প্রস্তর-মূর্ত্তির গায়ে যেমন কোথাও একটা বাটালির ক্ষীণতম আঁচড়ের দাগ দেখা যায় না, তেমনি জয়দেবের শ্লোকের শব্দ-বিন্যাসের মধ্যে কোথাও কবি-শিল্পীর চেষ্টার একটা ক্ষীণতম আঁচড়ের দাগও নেই।

তাই গীতগোবিন্দের শ্লোকের মধ্যে বীণার ঝংকারের মত, নূপুরের গুঞ্জনের মত, একটা মধুর সুর আপনা থেকে বেজে উঠেছে এবং সে-সুরের বৈশিষ্ট্য হলো, তা প্রাণের সুরের সঙ্গে গাঁথা। ভাষার সুর ধরবার জন্যে যাঁর কাণ তৈরী হয়েছে, তিনি গীতগোবিন্দের ভেতর শুনতে পাবেন অভিসারিকার নূপুর-ধ্বনি, শুনতে পাবেন শুকনো পাতার ওপর দিয়ে ভীরু সলজ্জ পায়ের চলে-যাওয়ার শব্দ, শুনতে পাবেন নিশীথরাতে ফুলন্ত কুঞ্জবনে চাঁদের আলোর জোয়ারের নিঃশব্দ প্রবাহের শব্দ। ভাষা-শিল্পী হিসাবে জয়দেবের প্রতিভার আর একটা দিক হলো, ভাষার সাহায্যে ছবি আঁকবার বিস্ময়কর ক্ষমতা। এই বিদ্যায় জগতে অনুপম হলেন দুজন কবি, কালিদাস আর রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এই দুজনের পাশে জয়দেবও সমান গৌরবে বসতে পারেন। জয়দেবের শ্লোকের চরণে চরণে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে ফুটে উঠেছে এক একটী অপরূপ চিত্র, ডাচ্ চিত্রকরদের মতন গাঢ় রঙের চিত্র। কিন্তু জয়দেবের অমরত্ব নির্ভর করছে, এই অনন্যসাধারণ ভাষা-শিল্পের সঙ্গে তাঁর অপরূপ রসের পরিবেশনে। সেখানেও তিনি কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের সমধর্ম্মী, যদিও এই তিনজন কবির শিল্প ও রস পরিবেশনের ধারা স্বতন্ত্র।

কবি হিসাবে জয়দেবের বৈশিষ্ট্য সেখানে, যেখানে ধ্বনির সঙ্গে তিনি সুরকে সংযোজনা করেছেন, চিত্রের সঙ্গে গতিকে রূপ দিয়েছেন, ছন্দের ঝংকারের ভেতর থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন প্রাণের বাণীকে, অলংকারের শত বন্ধনের ভেতর থেকে যেখানে কেঁদে উঠেছে তাঁর লিরিক মন। এই শেষোক্ত বিষয়ে তিনি হলেন চণ্ডীদাসের সমগোত্র।

জীবন ও কাব্য

জয়দেব আর চণ্ডীদাস, দুজনেই জীবনে করেছিলেন যে একান্ত প্রেমের সাধনা, সেই প্রেম-সাধনাই রূপান্তরিত হয়েছে রাধাকৃষ্ণের প্রেমে। তাই চণ্ডীদাস আর জয়দেবের কবিতার ভেতর থেকে যে-সুর বেজে ওঠে, যদিও তার বাইরের রূপ হলো ক্লাসিক, কিন্তু তার অন্তরের রূপ হলো লিরিক এবং সেইজন্যেই তা প্রত্যেক মানুষের মনে একটা স্পন্দন জাগিয়ে তোলে। তাই গীতগোবিন্দ পড়তে পড়তে, রাধাকৃষ্ণের মিলন ও বিরহের আড়ালে ফুটে ওঠে পদ্মাবতী-জয়দেবের মিলন ও বিরহ কাহিনী, কালিন্দীর তীরে নীপকুঞ্জের ছায়ায় ঘুরতে ঘুরতে মন চলে যায় অজয়ের তীরে, বৃন্দাবনের অন্তরে ফুটে ওঠে কেন্দুবিল্ব, ভক্ত আর ভগবান এক হয়ে যায়। নিজের জীবন দিয়ে জয়দেব যে প্রেম-সাধনা করেছিলেন, সেই প্রেমের মহাবার্ত্তাই তিনি রেখে গিয়েছেন তাঁর গীতগোবিন্দ কাব্যে। যার ফলে তাঁর পরবর্ত্তী যুগে সেই প্রেম-সাধনাকে মানব-ধর্ম্মে পরিণত করেন চৈতন্যদেব।

মানসচক্ষে দেখছি, পুণ্যধাম জগন্নাথক্ষেত্রে গম্ভীরার ভেতরের এক স্নিগ্ধ কক্ষে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বসে। তাঁর সামনে বসে শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর আর রায় রামানন্দ। মহাপ্রভুর সামনে খোলা গীতগোবিন্দের পুঁথি। মহাপ্রভু গীতগোবিন্দ পড়ছেন, নিত্য তিনি এই পুঁথি পড়েন। এক-একটী শ্লোক পড়েন, আর তারপর সুরু হয় আলোচনা, আস্বাদন। জগতের তিনজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও রসিক গম্ভীরার সেই গোপনকক্ষে গীতগোবিন্দ নিয়ে সেদিন যে রসালোচনা করতেন, হায়, তার একটী বর্ণও আমাদের কানে এসে পৌছল না। ইতিহাস শুধু এই সাক্ষ্য রেখে গেল, সেযুগের বাংলার তিনটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ জয়দেবের এই অমর কাব্য থেকে নিত্য আহরণ করতেন তাঁদের প্রাণের খোরাক।

গীতগোবিন্দে অশ্লীলতার অভিযোগ

এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করবার একটা বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোক গীতগোবিন্দকে অশ্লীল বলে মনে করতেন বা করেন। গীতগোবিন্দের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যে মিলন-বর্ণনা আছে, তার মধ্যে তাঁরা যৌন-সম্ভোগের প্রকাশই দেখতে পান এবং সেই জন্যে প্রকাশ্যে নাক সিঁটকে গোপনে পড়ে তার যৌন-স্বাদ গ্রহণ করেন। একথা অবশ্য ঠিকই যে, গীতগোবিন্দ বালক বা শিশুদের জন্যে লেখা নয়, গীতগোবিন্দ হলো তাঁদের জন্যে যাঁদের বস্তু-জ্ঞান হয়েছে, যাঁরা রসের অধিকারী, যাঁরা দেহকে জানেন ও চেনেন এবং জানেন ও চেনেন বলেই দেহের ওপারে দেহাতীতকেও জানেন।

গীতগোবিন্দ কিংবা বৈষ্ণব-কবিতার সম্ভোগ-লীলার বর্ণনার পেছনে যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে, আমি সেই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাখ্যার কথা এখানে তুলতে চাই না…সাহিত্যিক হিসাবে, আমার কাছে গীতগোবিন্দ হলো প্রথমত একখানি অমর সাহিত্য-সৃষ্টি এবং জগতের প্রত্যেক সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি যে-রীতি অনুসরণ করে শ্লীলতা ও অশ্লীলতা দুই-এরই উর্দ্ধে চলে যায়, গীতগোবিন্দও তেমনি শ্লীলতা ও অশ্লীলতার উর্দ্ধে এক পরম রস-বস্তু। সাহিত্যের ইতিহাসে যুগে যুগে দেখেছি, এক শ্রেণীর তত্ত্বব্যবসায়ী এই শ্লীলতা আর অশ্লীলতার প্রশ্ন নিয়ে অযথা চীৎকার করে গিয়েছেন এবং এখনো হয়ত করবেন। কিন্তু রসিকজনেরা এই সমস্যার মীমাংসা সর্ব্বকালের জন্যে করে গিয়েছেন। যৌন-ব্যাপারের উল্লেখমাত্রই তা অশ্লীল হয় না, শ্রেষ্ঠ শিল্পী বা কবির কাছে একটা ফুলের বিকাশও যা, যৌন-লীলাও তাই। শ্রেষ্ঠ শিল্প হলো শ্লীলতা এবং অশ্লীলতা দুয়েরই উর্দ্ধে।

যে কোন রসিক লোক রচনার উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতি থেকেই বুঝতে পারেন সেটা যৌনবস্তু হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, না, রস বস্তু হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। চিকিৎসক যখন নগ্ন প্রসূতি নারীর যোনি-পথ থেকে মানব-শিশুকে বের করে আঁনেন. তখন সেই চিকিৎসকের কাছে নারী-লিঙ্গের কোন যৌন-তাৎপর্য্যই থাকে না, সেই একই যোনি তখন তাঁর কাছে তার সমস্ত কাম-সম্পর্কতা হারিয়ে ফেলে। ঠিক সেই রকম রসের ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রে অধিকারী শিল্পী যখন যৌন-বস্তুর উল্লেখ করেন, তখন তাঁর বৃহত্তর উদ্দেশ্যের মধ্যে, তাঁর সৃজন-সৌন্দর্য্যের মধ্যে, যোনি বা সঙ্গম তার প্রাকৃত যৌন-রূপকে হারিয়ে ফেলে, এবং তা হয়ে ওঠে তখন অন্য এক ভাবের প্রতীক, যে-ভাব ঐ প্রতীকের সাহায্য ছাড়া অমন গভীরভাবে, অমন সহজ ও সুন্দরভাবে আর প্রকাশ করা সম্ভব হতো না।

বৈষ্ণব কবিরা তাঁদের অপরূপ কাব্যের ভেতর দিয়ে চেয়েছেন, মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনের পরিপূর্ণ রূপকে, তার মিলন, বিরহ, বিচ্ছেদ ও আকুতিকে তুলে ধরতে, সোজা কথায় যাকে বলে মানুষের সঙ্গে তার স্রষ্টা ভগবানের মিলন। যুগে যুগে মানুষ চলেছে সেই মহা-অভিসারে, যাকে চোখে দেখা যায় না, অথচ যার বাঁশী শোনা যায়, সেই দেহাতীত প্রিয়তমের অভিসারে। মানব-মনের এই অনন্ত অভিসার, এই নিত্য রাসলীলা ফুটে উঠেছে রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও মিলনে। বৈষ্ণব কবিরা তাই পরম-দেবতা রাধাকৃষ্ণের প্রেম, বিরহ ও মিলন লীলার ভেতর দিয়ে চেয়েছেন মানব-মনের সেই পরম-আকুতিকে ফুটিয়ে তুলতে। যিনি দেহাতীত, যিনি সকল ইন্দ্রিয়ের স্পর্শের বাইরে, কেমন করে বুঝবো তাঁকে? কেমন করে বুঝবো তাঁর বিরহে কি জ্বালা? তাঁর স্পর্শে কি শান্তি?

যে-পন্থা অনুসরণ ক'রে বিজ্ঞান চরম সত্যের দিকে এগিয়ে চলে, তা হলো জানা থেকে অজানায়। যেটাকে জানি, সেটাকে আশ্রয় করেই অজানা সত্যের দিকে এগুতে হবে। অজানাকে জানবার সেইটেই হলো মানুষের একমাত্র উপায়। তেমনি তত্ত্বের ক্ষেত্রে, রসের ক্ষেত্রে, মানুষ অজানা পরম দুর্জ্ঞেয়কে জানবার জন্যে, দেহাতীতকে জানবার জন্যে দেহের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। দেহের সঙ্গে, তার ব্যথা, বেদনা, সুখ-বিলাস, তৃপ্তি-অতৃপ্তির সঙ্গে আমরা একান্ত সহজভাবেই সম্পৃক্ত। দেহগত স্তরে আমরা জানি বিরহের কি জ্বালা, জানি মিলনের কি সুখ, জানি বাসর-রাত্রির প্রথম প্রিয়-অঙ্গ স্পর্শের কি রোমাঞ্চ। তাই বৈষ্ণব কবিরা পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের ও রমণের স্বাদ বোঝাবার জন্যে সেই দেহগত মিলন-বিরহের প্রকাশকেই প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছেন। তাই জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যে

আমরা রাধাকৃষ্ণের রমণের যে বর্ণনা পাই, সে হলো দেহ-প্রতীককে আশ্রয় করে দেহাতীতের সঙ্গে রমণের স্বাদ। মানুষ জীব-দেহে যে চরম-আনন্দের বাস্তব স্বাদ পায়, সে হলো রমণের স্বাদ। সেই এক আত্মবিস্মৃত আনন্দ-মুহূর্ত্তে সমস্ত পার্থিব দৈন্য ও অস্বাচ্ছন্দ্যকে ভুলে মানুষ ক্ষণিকের জন্যে দেহাতিরিক্ত আর-এক আনন্দের কণামাত্র আভাস পায়। সেইটুকু হলো মানুষের জানা আনন্দের অভিজ্ঞতা। বৈষ্ণব কবিরা সেই জানা অভিজ্ঞতার আশ্রয় নিয়ে অজানা সেই মহানন্দকে, অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব আত্মার রমণের আনন্দকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। ব্রহ্মানন্দ-স্বাদকে প্রকাশ-যোগ্য ভাষার প্রতীকে বোঝাতে হলে, এ ছাড়া মানুষের হাতে যোগ্যতর আর কোন উপায় বা অবলম্বন নেই। শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্ন এখানে ওঠে না।



শৃঙ্গার বা আদিরস

বৈষ্ণব কবিতা বা গীতগোবিন্দের ভেতর যে-রস পরিবেশিত হয়েছে, তার নাম হলো শৃঙ্গার রস বা আদিরস। এই শৃঙ্গার রস বা আদিরসের অন্যতম চরম সার্থক প্রকাশ হলো গীতগোবিন্দ। গীতগোবিন্দের প্রত্যেক শ্লোক, শ্লোকের প্রত্যেক অক্ষর এই রসে টইটম্বুর হয়ে আছে। সমস্ত কাব্যের মধ্যে এমন কোন শ্লোক নেই, শ্লোকে এমন কোন পদ নেই, পদে এমন কোন অক্ষর নেই যা এই অমৃত-রসে নিষিক্ত হয়নি। কবির প্রাণের উত্তাপে ভাষা গ'লে হয়ে গিয়েছে রস-নির্ঝরিণী, আদি-রসের নির্ঝরিণী।

আমরা সাধারণ ভাষায় যে-অর্থে রস, ভাব, প্রেম, মান, অভিমান ইত্যাদি কথা ব্যবহার করি, বৈষ্ণব-সাহিত্যে কিন্তু এই সব কথার একটা করে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সংজ্ঞা বা অর্থ আছে, যে সংজ্ঞার সঙ্গে পরিচিত না হলে বৈষ্ণব-কবিতার আসল স্বাদ পাওয়া সম্ভব নয়। অণু বা পরমাণু আমরা সাধারণ ভাষায় যে অর্থে ব্যবহার করি, বৈজ্ঞানিকের কাছে কিন্তু এই দুটী কথার তাৎপর্য্য তার অতিরিক্ত অনেক কিছু। বৈজ্ঞানিকের কাছে অণু বা পরমাণুর একটা রূপ আছে, সে-রূপের আঙ্কিক ব্যাখ্যা আছে, ওজন আছে, গতি আছে, তেজ আছে। ঠিক সেই রকম বৈষ্ণব-সাহিত্যে এমন কতকগুলি শব্দ প্রায়ই ব্যবহৃত হয়, রস-বিজ্ঞান-সম্মত যাদের একটা স্বতন্ত্র টেক্‌নিক্যাল তাৎপর্য্য আছে। এই শব্দ-তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত না হলে, বৈষ্ণব-সাহিত্য বোঝা সম্ভব নয়।

বৈষ্ণব-রস-শাস্ত্র অনুযায়ী শৃঙ্গার রসের একটা স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা আছে। শৃঙ্গ মানে হলো, সম্ভোগ করবার ইচ্ছার পূর্ণ জাগরণ। এই সম্ভোগ করবার বাসনা যাতে পরিতৃপ্ত হয়, তাকে বলে শৃঙ্গার রস। প্রত্যেক সুরের যেমন একটা রূপ আছে, রূপের অধিষ্ঠাতা দেবতা আছে, তেমনি রসেরও রূপ আছে এবং তার অধিষ্ঠাতা দেবতাও আছে। শৃঙ্গার রসের রূপ হলো শ্যামবর্ণ, তার অধিষ্ঠাতা দেবতা হলেন শ্রীকৃষ্ণ।

এই শৃঙ্গার রস, যার মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছে কাম-ইচ্ছা, এই রস হলো জগতের আদি রস, কারণ এই কাম-ইচ্ছা অর্থাৎ সৃজন-বাসনা থেকেই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন হয়েছে। ভগবানের অন্তরে জাগে এই আদিম কাম, সৃজন-বাসনা, তিনি এক ছিলেন, বহু হবার বাসনা তাঁর মধ্যে জাগার ফলে সৃষ্ট হলো এই বিচিত্র বিশ্ব। তাই আমাদের শাস্ত্রে ভগবানকে বলা হয়, "রসো বৈ সঃ", তিনি রস, তিনিই আদি-রস। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সেই আদিরসের রসঘন প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি।

আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহারে কাম শব্দের একটা কুৎসিত তাৎপর্য্য দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে ও রস-সাহিত্যে কামের মানে হলো আদিম সৃজন-বাসনা, সেই অনাদি শক্তি যা অনন্ত কাল ধরে বীজ থেকে অঙ্কুরকে ফোটায়, অঙ্কুর থেকে বৃক্ষকে জন্ম দেয়, বৃক্ষ থেকে জন্ম দেয় ফুল আর ফল। সমস্ত জীবনের জননী। তাই আমাদের বিবাহের মন্ত্রের একটা প্রধান অংশ হলো কামস্তুতি। এই কামকে স্তুতি বা স্তব করে আমাদের বিবাহ সিদ্ধ ও সার্থক হয়। এই কামস্তুতির মন্ত্র হলো,

ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ
কামঃ কামায়াদাৎ।
কামো দাতা, কামঃ প্রতিগ্রহীতা
কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ।

এই কন্যাকে কে সম্প্রদান করছে ?
কাকেই বা সম্প্রদান করা হচ্ছে ?
কামই এই কন্যাকে সম্প্রদান করছে।
এবং কামকেই সম্প্রদান করছে।
কামই দাতা, কামই গ্রহীতা।

সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন সমুদ্রে মিলিয়ে যায়, তেমনি এরা কাম-সমুদ্রেই মিলিয়ে গেল।

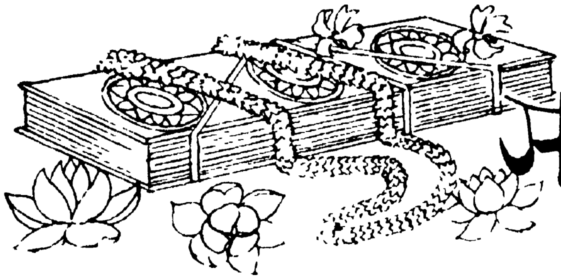
এই আদি-রসের বিলাস বা লীলার লক্ষ্য হলো আনন্দ, যে-আনন্দ হলো সকল জীবের কাম্য। আনন্দকে লাভ করাই হলো জীব-লীলার চরম ও পরম লক্ষ্য, কারণ ভগবান হলেন নিত্য আনন্দস্বরূপ। উপনিষদে তাই বলেছে,

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।

আনন্দ থেকেই এই নিখিল প্রাণময় বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে, আনন্দকে আশ্রয় করেই জীব জীবনধারণ করে এবং জীব-লীলার শেষে এই আনন্দেই লয়প্রাপ্ত হয়। রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলার মধ্যে এই আনন্দের পরমতত্ত্বই প্রকট হয়ে উঠেছে। স্বয়ং ভগবান এই আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করবার জন্যে নিজেকে বহুরূপে বিস্তার করে লীলা করছেন। সেই হলো বৃন্দাবন-লীলা। বৃন্দাবনে শ্রীমতী আর সখীদের সঙ্গে যে রাস-লীলা শ্রীকৃষ্ণ করেছিলেন, অনন্তকাল জুড়ে প্রত্যেক নর-নারীর অন্তরেই চলেছে সে নিত্য রাস-লীলা।



বৈষ্ণবতত্ত্বের সারকথা



গীতায় ভগবান আত্মসমর্পণ-যোগের কথা অর্জ্জুনকে বলেন। মুক্তি পাবার যত পথ আছে, যত ক্রিয়া-কাণ্ড, তপস্যা আছে, একে একে তাদের বর্ণনা দিয়ে ভগবান শেষকালে অর্জ্জুনকে বল্‌লেন, হে অর্জ্জুন, এই সব দুরূহ সাধনা বা তপস্যা যদি না করতে চাও, তাতে কোন ক্ষতি নেই। আমাকে পাবার একমাত্র সহজ যে-পথ, সে-পথ তোমাকে বলে দিচ্ছি, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—সমস্ত ধর্ম্ম, ক্রিয়াকাণ্ড বিসর্জ্জন দিয়ে তুমি শুধু একান্তভাবে আমার শরণ গ্রহণ কর, তোমার যা কিছু, সব আমাতে সমর্পণ কর, তাহলেই আমি তোমাকে সকল দুঃখ, সকল ব্যথা থেকে মুক্ত করে দেবো অমৃত আনন্দ। বৃন্দাবনে শ্রীমতী আর গোপ-বধূরা সেই পন্থাই গ্রহণ করেন। মান-অপমান, ভাল-মন্দ, সুবিচার-কুবিচার, নিন্দা-স্তুতি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে তাঁরা একমন হয়ে চেয়েছিলেন গোবিন্দকে এবং আনন্দে গোবিন্দ দিয়েছিলেন তাদের কাছে ধরা। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা হলো সেই আত্মসমর্পণ-যোগেরই জীবন-পরীক্ষা। গোপী আর শ্রীমতীর ভালবাসার ভিতর দিয়ে এই আত্মসমর্পণ-যোগের সার কথাই বলা হয়েছে। ভগবানকে পেতে হলে অতি কঠিন যাগ-যজ্ঞ করতে হয়, শত শত বৎসর ধরে কঠোর তপস্যা করেও যোগীরা তাঁর দর্শন পান না। অথচ এই আত্মসমর্পণ-যোগে বলা হয়েছে, তাঁর শরণ নিলেই তাঁকে পাওয়া যায়, কোন দুশ্চর তপস্যা করতে হয় না, কোন কঠোর যজ্ঞ করতে হয় না, কোন ক্রিয়া করতে হয় না। আপাতত শুনতে মনে হয়, এই আত্মসমর্পণ যোগ তো খুবই সহজ। কিন্তু এই যোগ সাধন করতে গেলেই দেখা যায়, যত সহজ মনে হয়, তত সহজ নয়। বাইরে কোন ক্রিয়া করতে হয় না বটে কিন্তু অন্তরকে নিঃশেষে তাঁকে দিতে গেলেই দেখা যায়, অন্তরের ভেতর সংগোপনে বহু

ফাঁক থাকে। তাঁর কাছে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করতে গেলেই দেখা যায় বহু বাধা মনকে জড়িয়ে আছে। সেই সমস্ত বাধাকে অস্বীকার করে একেবারে নিঃশেষ দান না হলে, তিনি ধরা দেন না।

সেই কথা বোঝাবার জন্যেই শ্রীমতী আয়ান ঘোষের ঘরে কুলবধূ হয়ে আসেন। কুলের বাধা নারীর পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা। সামাজিক লজ্জার বাধা আছে, কুলশীলের বাধা আছে, ফলপ্রাপ্তির লোভের বাধা আছে, অহং গরিমার শত শত সূক্ষ্ম বাধা আছে। তাই আমরা বৃন্দাবন-লীলায় দেখি, গোপীরা কুলের বাধা পেরিয়ে, লজ্জার বাধা পেরিয়ে সমস্ত আত্মসুখের বাধা পেরিয়ে আকুল অন্তরে শুধু বললে, হে কৃষ্ণ, আমরা শুধু তোমাকেই চাই, সুখের জন্যে তোমাকে চাই না, ঐশ্বর্য্যের জন্য তোমাকে চাই না, তোমার জন্যেই তোমাকে চাই! এই কৃষ্ণের জন্যই কৃষ্ণ প্রীতি হলো নিষ্কাম ভালবাসা। একমাত্র এই নিষ্কাম ভালবাসা দিয়েই ভগবানকে পাওয়া যায়।



রাধাপ্রেম ও চৈতন্যদেব

বৈষ্ণবের মতে, একমাত্র যে-প্রেমে ভগবান বাঁধা, সে প্রেমের নাম হলো রাধা-প্রেম। যে-প্রেম দিয়ে, প্রেমের যে বিচিত্র গভীর লীলার বিকাশে, চির-সৌন্দর্য্যের সার শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেছিলেন, সেই প্রেম হলো সাধ্য-শিরোমণি। রায় রামানন্দ বিস্তৃতভাবে বলেছেন সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে কিন্তু তার সর্ব্ব-পরিশেষে বলেছেন, "রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি" অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।

নিজের জীবনে এই রাধা-প্রেম জীবন্তভাবে ব্যাখ্যা করবার জন্যেই চৈতন্যদেব নীলাচলে অপরূপ লীলা করেন। তাঁর গম্ভীরা লীলার উদ্দেশ্য হলো, নিজে আচরণ করে সাধারণ লোকদের শিক্ষা দেওয়া, রাধা-প্রেম কাকে বলে, কি তার রূপ, কি তার প্রকাশ? কামদগ্ধ পৃথিবী ভুলে গিয়েছিল সেই প্রেমামৃতের স্বাদ, যে-প্রেম একদিন বৃন্দাবনে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল। চৈতন্যদেব তাঁর নিজের জীবনে রাধার সেই দিব্যপ্রেমের বিচিত্র রূপ-মাধুরীকে আবার সত্য করে তোলেন, তার প্রত্যেকটি অঙ্গকে নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতি দিয়ে সজীব করে তোলেন। রাধা ভাবে তন্ময় চৈতন্য-দেবকে বর্ণনা করে কবি নরহরি গেয়েছেন,

গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়
জাগিয়া রজনী পোহায়।
ক্ষণে করয়ে বিলাপ
ক্ষণে রোয়ত ক্ষণে কাঁপ।

ক্ষণে ভিতে মুখ শির ঘসে
কই নহি রহ পহু পাশে।
ক্ষণে কান্দে তুলি দুই হাত
কোথায় আমার প্রাণনাথ!

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ,—সেই ঈশ্বরকে, সেই পরমপুরুষকে, সেই শ্রীকৃষ্ণকে পাবার একমাত্র পথ হলো যে প্রেম, প্রেমাবতার চৈতন্যদেব বিভ্রান্ত মানুষদের জন্যে নিজে সেই প্রেমের আচরণ করে দেখিয়ে গিয়েছেন, নীলাচলে তাঁর গম্ভীরা লীলায়। এই প্রেমই জয়দেব কবি তাঁর গীতগোবিন্দে অপরূপ রসে মূর্ত্ত করে গিয়েছেন।

এই প্রেমের কথাই বোঝাতে গিয়েই ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, এই প্রেম কি সামান্য জিনিস গা? চৈতন্যদেবের এই প্রেম হয়েছিল। প্রেমের দুটী লক্ষণ। প্রথম, জগৎ ভুল হয়ে যায়। চৈতন্যদেব বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, সমুদ্র দেখে যমুনা ভাবে। দ্বিতীয় লক্ষণ নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, এর উপরও মমতা থাকবে না, দেহাত্মবোধ একেবারে চলে যাবে। তবে বুঝবে প্রেম হয়েছে।

নীলাচলে চৈতন্যদেব শ্রীমতীর মতন সর্ব্বদাই মহাভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন।

কৃষ্ণ-প্রেমে বিভোরা শ্রীমতী প্রায়শই বিভিন্ন দশায় থাকতেন, কখনো অন্তর্দ্দশা, কখনো বাহ্যদশা, কখন বা অর্দ্ধ বাহ্যদশা। নীলাচলে দারুব্রহ্ম নীলমাধবকে দেখে চৈতন্যদেবের নয়নের সামনে বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের রূপই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সেই অচল দারুমূর্ত্তি তাঁর প্রেমে সজাগ হয়ে ওঠে। কৃষ্ণ-প্রেমে বিভোর হয়ে তিনিও সর্ব্বদাই সেই তিন দশায় অবস্থান করতেন।

এই মহাভাবের স্বরূপ নীলাচলে তাঁর জীবনের একটি ঘটনায় অপরূপভাবে ফুটে আছে।

গম্ভীরার কক্ষে রাত্রিতে মহাপ্রভু ঘুমুচ্ছেন। ঘুমের মধ্যে সেদিন তিনি এক অপরূপ স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন, তিনি যেন বৃন্দাবনে রাসমণ্ডলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। অনিমেষ নয়নে দেখছেন, গোপীপরিবৃত হয়ে আনন্দরসঘনমূর্ত্তি শ্যামনটবর নৃত্য করছেন···নৃত্যের তালে তালে আনন্দের সাগর দুলে উঠছে···সে-আনন্দের তরঙ্গে মহাপ্রভুর সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে···

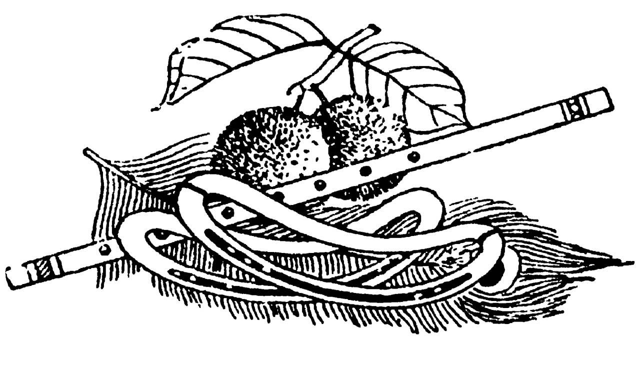
এমন সময়, প্রভাত হয়ে গিয়েছে দেখে মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ মহাপ্রভুকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুল্লো। নিদ্রা-ভঙ্গে বিহ্বল হয়ে মহাপ্রভু চারিদিকে চেয়ে

দেখেন, কোথায় গেল সেই শ্যামল কিশোর ? কৃষ্ণ-বিরহে তাঁর সারা দেহ জ্বলে ওঠে। কোন রকমে স্নান সেরে তিনি পাগলের মতন ছুটলেন জগন্নাথ-মন্দিরে।

জগমোহনের একপ্রান্তে গরুড়-স্তম্ভটীর কাছে দাঁড়িয়ে মহাপ্রভু-নির্নিমেষ নয়নে পুরুষোত্তমের দিকে চেয়ে দেখেন। ক্রমশ চারদিক থেকে পূজার্থীদের ভিড় জমে আসে। কিন্তু মহাপ্রভুর সেদিকে লক্ষ্য নেই। তিনি শুধু দেখছেন, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অপূর্ব্ব সুন্দরতনু শ্যামরায়। দুই চোখ দিয়ে দরদরিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। কতক্ষণ যে সেইভাবে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তার কোন ধারণাই তাঁর ছিল না। হঠাৎ তাঁর চমক ভেঙ্গে গেল চীৎকারে, দেখেন তাঁর সেবক গোবিন্দ এক নারীকে তীব্রভাবে ভৎর্সনা করছে, নারী শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে আছে। সেদিন জগমোহনের ভেতর ঢুকতে না পেরে এই উড়িয়া নারী গরুড়-স্তম্ভের ওপর কোন রকমে উঠে। বিগ্রহ দেখতে দেখতে নারীটি এমন তন্ময় হয়ে যায় যে, কখন একটা পা মহাপ্রভুর কাঁধের ওপর রেখেছে, তা তার হুঁস ছিল না। সেইভাবে মহাপ্রভুর কাঁধে পা রেখে তন্ময় হয়ে সে বিগ্রহ দেখছিল। মহাপ্রভুরও কোন চেতনা ছিল না। মহাপ্রভুর খোঁজে গোবিন্দ এসে সেই দৃশ্য দেখে নারীটিকে টেনে নামায় এবং তীব্রভাবে ভৎর্সনা করতে আরম্ভ করে।

সমস্ত ব্যাপার শুনে চৈতন্যদেব ভাবে স্তব্ধ হয়ে যান, দুই হাত জোড় করে সেই নারীর সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, তুমি ভাগ্যবতী, আমার নমস্য! তোমার এই সকল-ভোলা আর্ত্তি যেন আমি পাই!

এই তন্ময়তা, অর্থাৎ কৃষ্ণময়তা হলো রাধা প্রেমের প্রধানতম লক্ষণ। এই প্রেম যার ঘটে, "কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তাঁর।"



চৈতন্যদেবের গম্ভীরালীলা

মহাপ্রভুর এই দিব্যোন্মাদময় গম্ভীরা-লীলার মধ্যেই আছে, সকল বৈষ্ণব-কবির পরমসাধ্য-ধন, রাধা-প্রেমের নিগূঢ় তত্ত্ব। কবি বাসুদেব ঘোষ সেই কথাই অপরূপ মধুর পয়ারে গেয়ে গিয়েছেন,—

যদি গৌর না হ'ত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা
জগতে জানাত কে।
মধুর-বৃন্দা-বিপিন-মাধুরী
প্রবেশ-চাতুরী-সার।
বরজ-যুবতী-ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার।

প্রেমময়ী শ্রীরাধা হলেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি, হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ। "কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তাঁর।" রায় রামানন্দ সহজ ভাবে এই রাধাতত্ত্ব বোঝাবার জন্যে বলেছেন,—

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আ-হ্লাদিনী।
সেই শক্তি-দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥

হ্লাদিনীর সার অংশ প্রেম তার নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের ব্যাখ্যান ॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা-ঠাকুরাণী ॥ (চৈ চঃ, মধ্যলীলা)

এই রাধা-ভাবে তন্ময় হয়ে নীলাচলধামে গম্ভীরাকক্ষে মহাপ্রভু যে লীলা-মাধুর্য্য বিকশিত করে গিয়েছেন, তার মধ্যে মূর্ত্তি ধরে জেগে উঠেছে এই মহা-প্রেম, যে-প্রেমকে যুগ যুগ ধরে বৈষ্ণব-কবিরা অপরূপ সুরে, ছন্দে, ভাষায় রূপ দিয়ে গিয়েছেন, শ্রীমতী হলেন যার মূর্ত্ত বিগ্রহ।

মহাপ্রভুর জীবনের এই শেষতম অধ্যায়ে দেখি, ক্রমশ ক্রমশ তিনি কি জাগরণে, কি নিদ্রায়, কি স্বপ্নে, সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-চেতনায়, কৃষ্ণ-বিরহে লীন হয়ে আছেন।

তাঁর দুই পাশে দুই মহাভক্ত, স্বরূপ আর রামানন্দ, সর্ব্বদাই তাঁর কাছে কাছে আছেন। দিনের বেলা কোন রকমে সমুদ্র-স্নানে, জগন্নাথ-দর্শনে আর কীর্ত্তনে কেটে যায় কিন্তু যেমনি অপরাহ্ন পড়ে আসতে থাকে, ধীরে ধীরে নামে সন্ধ্যার ছায়া, আকুলতর হয়ে ওঠে মহাপ্রভুর বিরহ। বিব্রত, আতঙ্কিত হয়ে ওঠে স্বরূপ আর রামানন্দ। সে দিব্য-উন্মাদনার মহাতরঙ্গের বেগ রোধ করবার শক্তি তাঁদের কোথায়? তাঁরা তবুও আলাপে, আলোচনায়, তাঁকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন, ভাগবত পড়ে শোনান, গীতগোবিন্দ পড়ে শোনান। এইভাবে রাত্রি শেষ হয়ে আসতে থাকে। মহাপ্রভুকে শয্যায় শুইয়ে তবে তাঁরা বিশ্রাম করতে যান।

একদিন এই রকম মধ্যরাত্রির আলাপ-আলোচনার পর মহাপ্রভুকে শয্যায় শয়ন করিয়ে স্বরূপ আর রামানন্দ বিশ্রামের জন্যে নিজেদের ঘরে গিয়েছেন। মহাপ্রভুর ঘরের দরজার কাছে শুয়ে আছে ভক্ত-ভৃত্য গোবিন্দ।

স্বরূপ আর রামানন্দ চলে যাবার পর, ঘরের বাইরে থেকে গোবিন্দ বুঝতে পারলো মহাপ্রভু শয্যা গ্রহণ করেননি। অবিরাম নাম গান করে চলেছেন। নিদ্রাহীন চোখে ভৃত্য গোবিন্দও ঘরের বাইরে বসে সেই মধুর নাম গান শোনে। শুনতে শুনতে সে-ও তন্ময় হয়ে যায়। হঠাৎ তার চমক ভাঙ্গতেই সে বুঝতে পারলো, মহাপ্রভুর ঘর নিস্তব্ধ। হঠাৎ মহাপ্রভু নীরব হয়ে গেলেন কেন? তবে কি ঘুমিয়ে পড়েছেন? ভক্ত-ভৃত্যের মন সন্দেহে দুলে উঠলো। ধীরে দরজা খুলে গম্ভীরা-কক্ষের ভেতরে উঁকি মেরে দেখে, ঘর শূন্য। গোবিন্দ আলো জ্বেলে চারিদিকে

খোঁজে। কি আশ্চর্য্য, ঘরের সমস্ত দরজা ভেতর থেকে বন্ধ! অথচ ঘরের মধ্যে মহাপ্রভু নেই।

গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ স্বরূপ আর রামানন্দকে ডেকে তুল্লো। মশাল জ্বেলে তিন জনে আতঙ্কিত অন্তরে খুঁজতে বেরুলেন। বাড়ীর আশে-পাশে চারদিকে খুঁজতে খুঁজতে মশালের আলোয় দেখতে পেলেন মহাপ্রভু গোশালার মধ্যে গাভীদের কাছে কর্দ্দমাক্ত বাসে বসে আছেন। মহাভাবের প্রভাবে তাঁর চেহারা বিস্ময়কর ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়ে গিয়েছে। সেই দীর্ঘ সুঠাম দেহ যেন বর্ত্তুলের মত বেঁকে গোল হয়ে গিয়েছে, হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে গিয়েছে, সারা দেহ বিকশিত কদম্বের মতন রোমাঞ্চিত, স্থির আয়ত দুই চোখ থেকে অবিরাম জলধারা গড়িয়ে পড়ছে। নিদ্রা ত্যাগ করে গাভীরা মহাপ্রভুকে পরিক্রমণ করছে, আদরে তাঁকে লেহন করছে। সমাধিতে মহাপ্রভুর কোন বাহ্য চেতনা নেই।

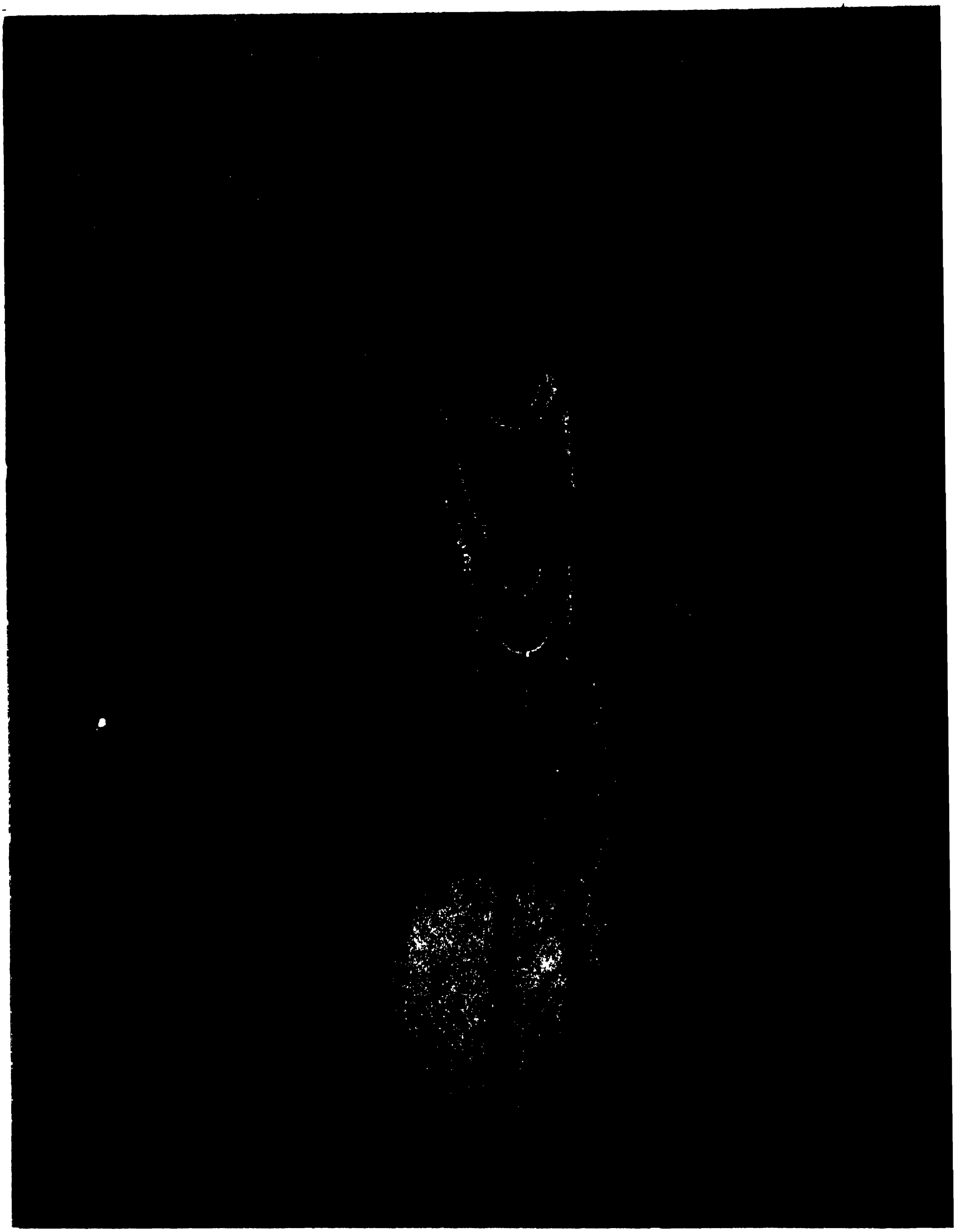
প্রভুর জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার জন্যে স্বরূপ আর রামানন্দ আকুল ভাবে নাম কীর্ত্তন করতে সুরু করে দিলেন।

বহু চেষ্টা-চরিত্রের পর মহাপ্রভুর সমাধি ভাঙ্গলে তিনি ব্যাকুল ভাবে চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। কেঁদে উঠলেন, এ তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে এলে?

বলেন আর দুই চোখ দিয়ে ধারা গড়িয়ে পড়ে। বহুক্ষণ পরে আবেগ সংবরণ করে বলেন, গম্ভীরার ঘরে বসে নাম-কীর্ত্তন করছিলাম, এমন সময় হঠাৎ কাণে এলো, মধুর বংশী-ধ্বনি! সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো, বুঝলাম, শ্যামরায় আমাকে বেণু সঙ্কেতে ডাকছে! আর কি আমি ঘরে থাকতে পারি? সেই বাঁশীর স্বর আমাকে টেনে নিয়ে এলো বৃন্দাবনে, দেখি, গোষ্ঠে গাভীরা বিহার করছে, আর আমার নওল-কিশোর বিকশিত কদম্বের তলায় বাঁশী বাজাচ্ছে। সেখান থেকে এ কোথায় আমাকে নিয়ে এলে তোমরা?

কৃষ্ণ-বিরহে উন্মাদ হয়ে ওঠেন মহাপ্রভু—যে-বিরহ একদিন উন্মাদ করে তুলেছিল শ্রীমতীকে। শ্রীমতীর মতনই তিনি আকুল ভাবে কেঁদে ওঠেন,

হা হা শ্যামসুন্দর,
হাহা পীতাম্বর-ধর,
হা হা রস-বিলাস-সাগর
কাঁহা গেলে তোমা পাই,
তুমি কহ তাহা যাই।



কাহা গেলে তোমা পাই
শ্রীগৌরাঙ্গদেব

এমনি এক দিব্য বিরহের মুহূর্তে মহাপ্রভুর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে বিরহের অমর শ্লোক,

যুগায়িতং নিমিষেণ
চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং
গোবিন্দবিরহেণ মে॥

চোখের পলক-পাতে মনে হয় যেন যুগ-যুগান্ত চলে যায়, নয়নে ছেয়ে আসে বর্ষার জলধারা, হে কৃষ্ণ, হে গোবিন্দ, তোমার বিরহে শূন্য যে আমার নিখিল জগৎ!

এমনি আর একদিন রাত্রিতে কৃষ্ণ-বিরহে অধীর হয়ে মহাপ্রভু একা সমুদ্রের তীরে চলে আসেন। পূর্ণ চাঁদের শুভ্র আলো রেণু রেণু হয়ে মিশে গিয়েছে সমুদ্রের নীল জলের সঙ্গে। মহাপ্রভুর দিব্য-নয়নে ফুটে ওঠে যমুনার তীরে হেমবরণা শ্রীমতীর সঙ্গে শ্যামবরণ কৃষ্ণের প্রেম-লীলা। নিজেকে আর তিনি ধরে রাখতে পারেন না। মহানন্দে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন নীল সাগরের বুকে। তরঙ্গে তরঙ্গে মহাসাগর সে-পুণ্য-দেহকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে কোণারকের দিকে।

এধারে দুর্ভাবনায়, আতঙ্কে ভক্তদের আহার-নিদ্রা চলে যায়। তাঁরা চারিদিকে খুঁজে বেড়ান কোথায় গেলেন মহাপ্রভু। জগন্নাথ মন্দির, গুণ্ডিচা বাড়ী, চাক পাহাড়, যেখানে যেখানে মহাপ্রভু যেতে পারেন বলে তাঁরা অনুমান করলেন, সেখানে সেখানে ছুটলেন। কিন্তু কোথাও মহাপ্রভুর কোন সন্ধান মিললো না। হঠাৎ স্বরূপ দামোদরের মনে একটা কথা জেগে উঠলো, ভাবের ঘোরে তিনি কি তবে কোণারকের পথ ধরে চলে গেলেন? সেই সঙ্গে তাঁর মনে জেগে ওঠে এক চরম আশঙ্কা, সমুদ্রের ধার দিয়েই কোণারকের পথ……তবে কি মহাসাগর টেনে নিল মহাপ্রভুকে?

সমস্ত ভক্ত মিলে কোণারকের পথে সমুদ্রের তীর ধরে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন। যাকেই পথে দেখেন, তাকেই জিজ্ঞাসা করেন, ওগো, তোমরা কি এই পথ দিয়ে যেতে দেখেছ, গৌরবর্ণ-তনু এক উন্মাদকে?

হঠাৎ স্বরূপের নজরে পড়লো, এক জেলে সমুদ্রের ধার দিয়ে চলেছে, কিন্তু সমুদ্রের দিকে তার নজর নেই……সে আপনার মনে নেচে নেচে চলেছে আর কেঁদে কেঁদে গাইছে হরিনাম। সেই হরি-ধ্বনির আকর্ষণে ভক্তরা ছুটে তার কাছে আসে। দেখে জেলের দুচোখ দিয়ে অশ্রু-ধারা গড়িয়ে পড়ছে আর মুখে অবিরাম ধ্বনিত হচ্ছে মধুর হরিনাম।

বিস্ময়ে স্বরূপ জিজ্ঞাসা করে,—হাঁ ভাই! এ দশা তোমার কে করলো?

জেলে বলে,—প্রভু, সাগরে জাল ফেলি, মাছ তুলি, বাজারে বেচি, খাই। কাল ভোর রাতে সাগরে জাল ফেলে পেয়ে গিয়েছি সোনার পাহাড়। জল থেকে আর জাল টেনে তুলতে পারি না, এত ভারী। মনে বড় আনন্দ হলো, না জানি কত মাছ আজ জালে পড়েছে। টেনে তুলে দেখি, হরি হরি, এক তাল কাঁচা সোণা গো……কাঁচা সোণার ঠাকুর গো……আমার জালের ভেতর বসে মৃদু মৃদু গাইছে হরিনাম……কোন জ্ঞান নেই, কোন চেতনা নেই, শুধু বলে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

স্বরূপ চীৎকার করে ওঠে,—কোথায় ভাই তোমার সেই সোণার ঠাকুর!

জেলে ভক্তদের বাড়ীতে নিয়ে আসে। সমস্ত ধীবর-পল্লী থেকে উঠছে নাম-গান। জেলের উঠোনের একধারে বসে মহাপ্রভু গেয়ে চলেছেন কৃষ্ণনাম আর তাঁকে ঘিরে ধীবর-পল্লীর যত নর-নারী আকুল হয়ে গেয়ে চলেছে সেই মধুর নাম।

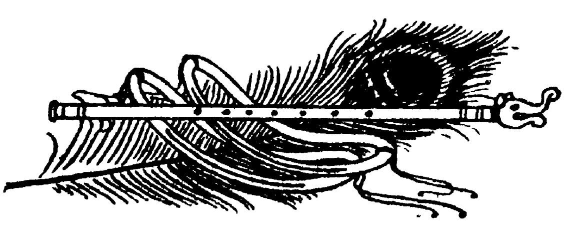
বহু চেষ্টাচরিত্রের পর স্বরূপ দামোদর প্রভুর জ্ঞান ফিরিয়ে আনেন, সারাপথ হরিনামে মুখরিত করে তাঁকে নিয়ে ফিরে আসেন গম্ভীরায়।

কোন কোন চরিতকার বলেন, মহাপ্রভু আবার আর একদিন পূর্ণিমার রাত্রিতে সমুদ্রের নীলরূপে তাঁর প্রিয়তমের দর্শন পেয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন। এবং সমুদ্রের অতল-নীলে অদৃশ্য হয়ে যান।

মহাপ্রভু ছিলেন ভগবানেরই অবতার। তাঁর স্পর্শে লোকে পেতো চিরানন্দের স্বাদ! তবে তিনি কেন এমনভাবে ভগবৎ-বিরহে কাঁদতেন?

তিনি যে মহাবস্তু পেয়েছিলেন,—তাকে পাবার পথ দেখিয়ে দেবার জন্যেই তিনি তাঁর শেষ-জীবনে এই বিরহ-লীলা প্রকট করেন। এই ঐকান্তিক বিরহের ভেতর দিয়েই শ্রীমতী তাঁর পরমেশ্বরকে তাঁর পরম-ঈপ্সিতকে পেয়েছিলেন, এই বিরহ-সাধনার ভেতর দিয়েই আমরা সাধারণ মানুষ পেতে পারি সেই পরমেশ্বরের সন্ধান। বৈষ্ণবকবিরা তাই এমন করে গেয়ে গিয়েছেন এই বিরহের গান। এই বিরহ বিচ্ছেদ নয়, এই বিরহই হলো প্রেমের আরতি।

গীতগোবিন্দ হলো এই প্রেমেরই আরতি, ছন্দে, ভাষায়, সুরে।



প্রেম প্রকরণ

বৈষ্ণব কবিদের একমাত্র বিষয় হলো, রাধাকৃষ্ণের প্রেম। এই প্রেমের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ছাড়া, এর প্রকাশের একটা স্বতন্ত্র ধারা আছে। বৈষ্ণব রসিকেরা এই প্রেমের বিবর্তনকে একটা নির্দ্দিষ্ট ও নিয়মবদ্ধ প্রণালীর ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। রসের ক্ষেত্রে এই বিস্তার ও বিশ্লেষণ বৈষ্ণব কবিতাকে বিচিত্র মাধুর্য্যের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বীজ থেকে ফলের জন্মের মধ্যে যেমন অনিবার্য্য কতকগুলি স্তর আছে, তেমনি প্রেমের জন্ম থেকে প্রেমের পরিণতি পর্য্যন্ত অনিবার্য্য কতকগুলি স্তর বা অবস্থার ভেতর দিয়ে প্রেমিক প্রেমিকাকে যেতে হয়। বৈষ্ণব রসাচার্য্যরা মনের সমস্ত অবস্থা ও গতি অতি সূক্ষ্মভাবে পরিলক্ষণ ক'রে এক অভিনব প্রেম-প্রকরণ-বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছেন। সাহিত্য লিখতে হলে যেমন ব্যাকরণ মেনে চলতে হয় এবং যিনি স্বাধীনতা নিতে জানেন তিনি ব্যাকরণ সত্ত্বেও তা নিতে পারেন, তেমনি বৈষ্ণব-সাহিত্যের ক্ষেত্রে রসের একটা ব্যাকরণ আছে, প্রত্যেক বৈষ্ণব কবিকে যা মেনে চলতে হয় এবং যার সঙ্গে পরিচিত না হলে বৈষ্ণব কবিতার পূরো আস্বাদ পাওয়া যায় না। এখানে সংক্ষেপে তার প্রধান অংশগুলির পরিচয় দেওয়া হলো।



পূর্ব্বরাগ

প্রত্যেক বৈষ্ণব-কবিতার আরম্ভ হলো, পূর্ব্বরাগে। পূর্ব্বরাগ হলো বৈষ্ণব-কাব্যের প্রথম সর্গ। নায়ক ও নায়িকার প্রথম দর্শনে, দর্শন অথবা শ্রবণের ভেতর দিয়ে পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে, তাকেই পূর্ব্বরাগ বলা হয়। এই প্রথম দর্শনের দিব্য-মুহূর্ত্তটিকে ঘিরে বহু বৈষ্ণব-কবি অপরূপ সব পদের সৃষ্টি করেছেন।

"সজনি কি হেরিনু যমুনার কূলে।
ব্রজকুল-নন্দন, হরিল আমার মন,
ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরুমূলে॥
গোকুল নগরী মাঝে, আর কত নারী আছে,
তাহে কোন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুলখানি, যতনে রেখেছি আমি,
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা॥"

কবে সে-যমুনার কূলে, ব্রজকুল-নন্দন বাঁশী বাজিয়ে শ্রীমতীর মন হরণ করেছিল, আজও সে-বাঁশী বেজে চলেছে···আজও চকিতে গৃহ-কাজের মাঝে, জীবনে যার আসে সৌভাগ্যের লগ্ন, সে শুনতে পায়, সেই বাঁশী বাজছে।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ হয়, কালীয় দমনের দিনে। কবি গোবিন্দদাস সেই অপরূপ মুহূর্ত্তটিকে রূপ দিয়ে গেয়েছেন। কালীয়-দমনের দিনে, কালিন্দীর তীরে, ছুটে এসেছে কতশত কৌতুহলী "ব্রজ নব বালা", তারা গলাগলি দাঁড়িয়ে আছে, যেন "থির বিজুরিক মালা"। সেই স্থির বিজলীর মালার মধ্যমণিরূপে, ওগো সখা, দেখে এলাম, এক অপরূপ মনোমোহিনী নারী······

নায়িকার চরিত্র বা অবস্থাভেদে পূর্ব্বরাগেরও আবার বিভিন্ন রূপ আছে। মুগ্ধা নারীর পূর্ব্বরাগ আর প্রগল্ভা নারীর পূর্ব্বরাগ এক-রকমের নয়। সাধারণত তিন রকমের প্রকাশ দেখা যায়—মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্ভা।

পূর্ব্বরাগের একটী প্রধান অঙ্গের নাম হলো, অভিযোগ। এইসব শব্দ আমরা সাধারণত যে-অর্থে ব্যবহার করি, বৈষ্ণব কবিরা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা অর্থে তা ব্যবহার

করে গিয়েছেন। পূর্ব্বরাগের সৃষ্টি যে-যে উপায়ে হয়, তার মধ্যে প্রধান হলো, সাক্ষাৎ দেখা, স্বপ্নে দেখা কিংবা চিত্রপটে দেখা। শুনেও পূর্ব্বরাগ হয়, তার মধ্যে সখীমুখে শোনা, দূতীমুখে শোনা, ভাটমুখে শোনা কিংবা বাঁশীর শব্দ শোনা হলো প্রধান। এই প্রথম দর্শনের প্রভাবের ফলে নায়ক বা নায়িকার মনে স্বভাবতই জেগে ওঠে বাসনা, কি করে অপর পক্ষের দৃষ্টি-আকর্ষণ করা যায়। যে-যে উপায়ে অপর পক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, তাদেরই বলে অভিযোগ। এবং এই অভিযোগের এক-একটী লক্ষণের অর্থও এক-এক রকম। যেমন নায়িকার অভিযোগ হলো, কিশলয়-দংশন অর্থাৎ নায়ককে দেখিয়ে নায়িকা নতমুখে কচি কিশলয় দাঁত দিয়ে দংশন করতে থাকে। নায়কও অভিযোগে পটু। নায়িকাকে দেখিয়ে নায়ক আধখানা খাওয়া ফল সখার মুখে তুলে দেয়, ফুলের মালা ছিঁড়ে স্রোতের জলে ভাসিয়ে দেয়, গাছের গায়ে নখের সাহায্যে লিখে রেখে যায় নায়িকার নাম ইত্যাদি।



মান

প্রেম যখন গাঢ় হয়ে ওঠে, তখন প্রিয়তমের নব নব মাধুর্য্যের স্বাদে অন্তর ভরপূর হয়ে থাকে। সেই পরিপূর্ণতার মধ্যে অন্তরে এক বিচিত্র অদাক্ষিণ্য দেখা দেয়। প্রিয়তমের সামান্য ত্রুটিতে মন বিরূপ হয়ে ওঠে। কারণে ও অকারণে তখন মানের প্রকাশ হয়। এই মান হলো, প্রণয়কে নিবিড়ভাবে আস্বাদন করবার আর একটা উপায়। কারণ মান করবার মধ্যে সব চেয়ে সংগোপন আনন্দের বিষয় হলো, অন্তরের বিশ্বাস, যে এই মান ভাঙবার জন্যে প্রিয়তম আছে। চির-মধুর যে তাকে নব নব রূপে ভোগ করবার জন্যেই মানের লীলা। মান নায়িকার হতে পারে, নায়কেরও হতে পারে। মানের দুটী রূপ। একটা হলো সহেতু মান, আর দ্বিতীয়টী হলো নির্হেতু মান। সহেতু মানের প্রধান লক্ষণ হলো, ঈর্ষা। নির্হেতু মানের উদাহরণ হলো—রাধা-কৃষ্ণ বিহার করছেন; হঠাৎ শ্রীমতীর নজরে পড়লো শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থিত কৌস্তুভ-মণিতে পড়েছে তাঁর ছায়া। সেই ছায়া-নারীকে অন্য নারী মনে করে শ্রীমতীর অন্তরে জাগে মান। সহেতু মানের আবার দুটী রকম আছে। একটী হলো সাধারণ মান, আর একটী হলো দুর্জ্জয় মান। জয়দেব কবির গীতগোবিন্দ হলো মানেরই কাব্য। তাঁর কাব্যের রস নির্ভর করছে, শ্রীমতীর মান ও শ্রীকৃষ্ণের মানভঞ্জনের ওপর। নায়িকার মানের আটটী প্রধান কারণ, (১) সখীর মুখে প্রিয়তমের ঔদাসীন্যের বার্ত্তা শ্রবণ, (২) শুক পাখীর মুখে অন্য নায়িকার নাম শ্রবণ, (৩) দূর থেকে বাঁশীর স্বর শ্রবণ, (৪) নায়কের দেহে নখচিহ্ন ইত্যাদি রতি-চিহ্ন দর্শন, (৫) প্রতিপক্ষ নায়িকার অঙ্গে রতি-ভোগের চিহ্ন দর্শন, (৬) নায়ক কর্ত্তৃক স্বপ্নে অন্য নারীর নাম উচ্চারণ, (৭) স্বপ্নে প্রিয়তমকে অন্য নারীর সংসর্গে দর্শন ও (৮) প্রত্যক্ষভাবে প্রিয়তমকে অন্য নারীর সংসর্গে দর্শন।

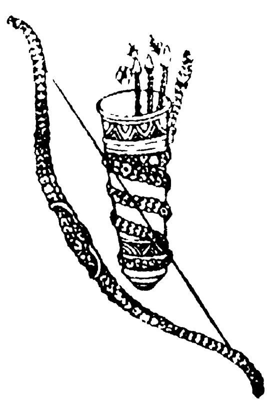
মানের ভেতরকার আসল কথা মহাপ্রভু তাঁর রচিত একটী শ্লোকে বলে গিয়েছেন,

> আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্-
> মর্ম্মহতাং করোতু বা।
> যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
> মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

এর মর্ম্মার্থ হলো, শ্রীমতী বলছেন, যত রকমে সম্ভব সেই লম্পট আমাকে কষ্ট দিক্ না কেন, তবু সেই আমার প্রাণ-নাথ, দ্বিতীয় আর কেউ নেই আমার!

প্রবাস বিরহ ও মাথুর

নায়ক ও নায়িকার পূর্ব্ব-সম্মেলনের পর যখন কার্য্যগতিকে নায়ককে স্থানান্তরে যেতে হয়, তখন সুরু হয় প্রবাসের বেদনা অথবা বিরহ। প্রবাস আবার দু' রকমের, অদূর প্রবাস ও সুদূর প্রবাস। কৃষ্ণ যখন কালীয় নাগকে দমন করবার জন্যে গিয়েছিলেন, তিনি নিকটেই ছিলেন কিন্তু সেই ক্ষণিক বিরহেই গোপীরা আকুল হয়ে ওঠে। কৃষ্ণ প্রতিদিন গোচারণে যেতেন। গোপীরা তাঁর আশা পথ চেয়ে কাতর হয়ে বসে থাকতো, কখন শ্রীকৃষ্ণ ফিরছেন। এই হলো অদূর প্রবাস। সুদূর প্রবাসের ব্যথা তিন রকমের বিরহে প্রকাশিত হয়,—ভাবী বিরহ, ভবন্ বিরহ আর ভূত বিরহ। অক্রূর বৃন্দাবনে এসেছেন, শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে যাবেন বলে। সেই সংবাদে শ্রীমতী আর গোপললনারা আকুল হয়ে ওঠে। এ হলো ভাবী বিরহ অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে যে বিরহ ঘটবে, তার জন্যে মর্ম্মজ্বালা। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাচ্ছেন, অশ্রু জলের ভেতর দিয়ে গোপললনারা দেখছে কৃষ্ণের রথের চাকা থেকে ধূলো উঠছে। সেই চাকার গতির সঙ্গে মথিত হয়ে যাচ্ছে গোপিকাদের অন্তর। এ হলো ভবন্ বিরহ অর্থাৎ যে-বিরহ সদ্য সদ্য ঘটছে। আবার ফিরে আসবো, এই আশা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়েছেন. অনিমেষ-আঁখি গোপীরা চেয়ে আছে, মাসের পর মাস চলে যায়, বৎসরের পর বৎসর চলে যায়, শ্রীকৃষ্ণ আর মথুরা থেকে ফিরে আসেন না। এ হলো ভূত বিরহ বা মাথুর। বৈষ্ণব কবিদের অন্তরবীণায় এই মাথুরের বিরহ যেভাবে বেজে উঠেছে, জগতে তার তুলনা নেই। এই বিরহের মহাসমুদ্রের অপর পারে হলো সম্ভোগ অথবা মিলন। বিরহের তীব্রতার মধ্যেই মিলনের মাধুর্য্যের অপূর্ব্বতা।



নায়িকার লক্ষণ

বৈষ্ণব রসশাস্ত্র অনুযায়ী নায়িকা দু'শ্রেণীর, স্বকীয়া ও পরকীয়া। শাস্ত্রমতে বিবাহের পর যে স্ত্রী পতির ইচ্ছানুসারিণী, পতির আনন্দ ও রতির জন্যে যে স্ত্রী সর্ব্বদাই ব্যস্ত, তিনি হলেন স্বকীয়া। দ্বারকার রাজপ্রাসাদে সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী প্রভৃতি রমণীরা কৃষ্ণের স্বকীয়া মহিষী। যে নারী তাঁর পরম-বাঞ্ছিতের সঙ্গে কোন আনুষ্ঠানিক বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ নন, অন্তরের প্রেমের ঐকান্তিকতায় যিনি নিয়ম-অনিয়ম সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়ে একচিত্ত হয়ে বাঞ্ছিতের নিকট পরিপূর্ণ-ভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন, তিনি হলেন পরকীয়া।

রতির বিভিন্নতা হেতু আবার নায়িকার প্রকার-ভেদ হয়। রতি তিন প্রকারের, সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা এবং সেই জন্যে নায়িকারও তিনটা শ্রেণী, সাধারণী নায়িকা, সমঞ্জস নায়িকা, আর সমর্থা নায়িকা।

কুব্জা মথুরার সাধারণ নারী। কংসের রাজপ্রাসাদে সে মালা যোগায়। এবং তার জন্যে রাজপ্রাসাদের ভেতরই বন্দিনীর মতন থাকে। একদিন হঠাৎ সেই বন্দীশালার বাইরে রাজপথে কুব্জা শ্রীকৃষ্ণকে দেখেছিল এবং দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। সর্ব্বভয় থেকে নিজেকে মুক্ত করে কুব্জা শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিজেকে নিবেদিতা করে বলে আমি তোমার, তুমি আমাকে ক্ষণিকের জন্য হলেও গ্রহণ কর। কুব্জা হলো সাধারণী নায়িকা।

রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের মহিষীরা হলেন সমঞ্জসা রতির নায়িকা। তাঁদের আদর্শ হলো, শাস্ত্র, সমাজ ও সংসারের সমস্ত নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিজেদের অর্পণ করেছিলেন। তাই তাঁরা সমঞ্জসা রতির নায়িকা।

একমাত্র শ্রীরাধা হলেন শ্রীকৃষ্ণের সমর্থা নায়িকা। জগতে যা কিছু নিয়ম আছে, যা কিছু ধর্ম্ম আছে, গৃহ-ধর্ম্ম, সমাজ-ধর্ম্ম, দেশ-ধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে শ্রীমতী একমাত্র কৃষ্ণকেই চেয়েছিলেন। তাই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নায়িকা। মহাভাবময়ী রস-রাসেশ্বরী।

